দুঃশাসন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিসার্স
কলিকাতা

দু'টাকা আট আনা

আশ্বিন—১৩৫২

বেঙ্গল পাবলিসার্সের পক্ষে প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুর্জ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উৎপল প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীঅনিল কুমার বিশ্বাস, ১১০।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শৈল চক্রবর্ত্তী ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

যেদিন স্পর্শ করিল বসন কুরু সভাতল মাঝে,
নতমুখী তুমি ছিলে কি দ্রৌপদী ঘৃণা অপমানে লাজে ?
পুত্তলিবৎ রহিল স্তব্ধ পঞ্চকেশরী বীর,
বন্দী দ্যূতের শৃঙ্খলে বাঁধা—আঁখিতে অগ্নি-নীর।
ব্যথাতুর নীল-নয়নে হেরিয়া কোন্ বিবসনা নারী,
অদৃশ্য হাতে জোগালে বসন তুমি হে দর্পহারী।
আজ এক নয়—শত পাঞ্চালী কাঁদিতেছে রাজপথে—
পার্থ-সারথি আসিবে কি তুমি পাণ্ডব রণরথে !
আজ এক নয়—শত কৃষ্ণার লাজ রাখ নারায়ণ,
সহস্র হাতে হরিছে বসন যুগের দুঃশাসন।
না[illegible], নাই গাণ্ডীবী—বীরহীন সভাতল
কে[illegible]র মানুষ মেষেরা মূর্খ স্তাবক দল।
পা[illegible]ন্যে হুঙ্কার হানো, চক্র লহ গো হাতে,
নব কুরুভূমে মোরা জেগে আছি তোমারি প্রতীক্ষাতে॥

—আশা দেবী

কালোজল

পুষ্করা

ভাঙা চশমা

বন-বিড়াল

খড়্গ

মমি

ডিম

পাইপ

ঘূর্ণি উড়ছে—শাঁ শাঁ করে শব্দ করছে বন ঝাউয়ের দল। কোনখানে একটি মানুষ নেই—যেন শ্মশান—

এপাশে ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দর। দেবীদাসের কোঠাবাড়ির পেছনে আর সব দীনতায় ম্লান হয়ে আছে। টিনের চাল, চাঁচের বেড়া। করোগেটেড্ টিন জলছে শানানো ইস্পাতের মতো। আম গাছের নীচে গোরুর গাড়ি বিশ্রাম করছে। অনেক দূরে থানার লাল রঙের বাড়িটা—দেবীদাসের দোতলা থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওটাকে। রুক্ষ মাটির বুক ফুঁড়ে যেন একটা রক্তজবা ফুটে উঠেছে।

ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। কাপড়ের আড়তদার সে—খুচরা পাইকারী সবই চলে। আশে পাশেই আট-দশখানা হাট্ তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে। চালান নেই। যা জোগাড় করা যায়, সরকারী দরে বিক্রী করতে গেলে পড়তা পোষাবে না। অতএব দোকানে ডবল তালা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাই ভালো। ব্যবসাও নেই—প্রকিটিয়ারিংয়ের বিড়ম্বনার হাত থেকেও মুক্ত।

গৌরদাস কিন্তু অস্থিরভাবে উস্‌খুস করছে। এখনো সত্যিকারের ব্যাবসাদার হয়ে ওঠেনি, তাই মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারছে না ব্যপারটাকে। সভয়ে একবার দেবীদাসের মুখেব দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললে, কিন্তু এভাবে চলবে কদিন? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে—

দু চোখে হঠাৎ আগুন জলে গেল দেবীদাসের। কোন কারণ নেই—হঠাৎ দপ দপ করে উঠল চোখের তারা দুটো। বাইরের জলন্ত পৃথিবী থেকে খানিকটা জ্বালা কি প্রতিফলিত হয়ে পড়ল?

স্থির গলায় দেবীদাস প্রশ্ন করলে, কী করতে হবে ?

—না কিছু না।—অখণ্ড মনোযোগ সহকারে গৌরদাস একটা সাবানের বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল : স্বনামধন্যা অভিনেত্রী চঞ্চলা দেবী বলেন—

ঝনাৎ করে নীচে একখানা সাইকেল আছড়ে পড়ল।

তারপরেই দোতালার সিঁড়িতে টক টক করে ভারী জুতোর শব্দ। বীর পাদদাপে সমস্ত বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে দোতালায় উঠে আসছে কেউ। আর যেই হোক—অন্তত চোখের জলে এক জোড়া কাপড়ের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে আসছে না নিশ্চয়ই। তারা আসে ভিক্ষুকের মতো—ছায়ার মতো নিঃশব্দ পা ফেলে। গদীর বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার দেবীদাসকে সেলাম করে তারা।

তিন বছর আগে ? তখন ছিল অন্যরকম। এক জোড়া পছন্দ না হলে দশ জোড়া নামানো হত।

থানার এল্, সি কানাই দে এসে ঘরে ঢুকল। চৌদ্দ টাকা মাইনের সাধারণ কনেষ্টবল, কিন্তু সেরেস্তার খাতা লেখে বলে মুহুরীবাবু নামে সে সম্মানিত। দরকার হলে পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে তাকে পাহারাও দিতে হয়। তবু নিজের সম্বন্ধে কানাই দের এক ধরণের আভিজাত্য বোধ আছে। দু—এক বছরের মধ্যেই সে যে জমাদার হয়ে যাবে এ প্রায় পাকাপাকি খবর।

রোদের চাইতে তেতে-ওঠা বালির তেজটা প্রবল। কানাই দের গলার স্বর যেন এস, পির মতো উদাত্ত আর গভীর : কি হে সরকার ফুলছ কেমন ?

অভ্যর্থনা করবার আগেই সশব্দে একখানা চেয়ারে আসন নিলে কানাই দে। লোকটার ধরণ ধারণ দেখলে পিত্তি চড়ে যায় দেবী-

দাসের। কিন্তু যা সময় পড়েছে এখন শত্রু বাড়ানো কোন কাজের কথা নয়। চারিদিকে অসংখ্য রন্ধ্র, যে কোনটার ভেতর দিয়ে শনি প্রবেশ করতে পারে।

উত্তরে খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসল দেবীদাস। তারপর এগিয়ে দিলে সিগারেটের প্যাকেটটা।

অভিজাত ভঙ্গিতে ঠোঁটের এক পাশে সিগারেট ধরে সেটাকে জ্বালালো কানাই দে। একটা চোখ বন্ধ করে তাকালো বিচিত্র তির্যক দৃষ্টিতে। যেন আগেই জমাদার হওয়ার জন্য মহড়া দিয়ে নিচ্ছে : এইবারে পঞ্চাশটা টাকা বার করো দেখি। চাঁদা।

—পঞ্চাশ টাকা ?—বিস্ফারিত চোখে দেবীদাস বললে, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা ?

—আল্‌বৎ। সমুদ্র থেকে এক আঁজলা। বন্ধ চোখটাকে আধ-খানা খুলে কানাই দে বললে : দারোগাবাবু শচীকান্ত বলে দিয়েছেন। ক্ষুব্ধ স্বরে দেবীদাস বললে, এ জুলুম।

—জুলুম ?—সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে সশব্দে যতখানি হেসে ওঠা যায়, সেই পরিমাণে কানাই দে হাসলো। বললে, পাঁচ পয়সার গাঁজাতেই শিব তুষ্ট থাকেন, কিন্তু তাতেই যদি হাত মুঠো করে বসো তা হলে দক্ষযজ্ঞ বাধতে পারে জানোতো সরকার ?

—হাঁ—দেবীদাস আবার চুপ করে রইল। শুধু পাঁচ পয়সার গাঁজাই ? এই ছোট বন্দরে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের যিনি দেবতা, সেই শিবটির খাঁই যে পাঁচ পয়সার চাইতে অনেক বেশী, সে কথা দেবীদাস যেমন জানে, কানাই দেও তার চাইতে এতটুকু কম জানে না। কিন্তু কী হবে সেকথা বলে।

পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে কানাই দে উঠল। অন্যমনস্কভাবে যেন

সিগারেটের বাক্সটাকে পুরে নিলে নিজের পকেটে। বললে, সন্ধ্যাতেই যাত্রার আসর বসবে। যেয়ো কিন্তু। দারগাবাবু বার বার করে বলে দিয়েছেন।

ক্লিষ্ট স্বরে দেবীদাস জবাব দিলে, আচ্ছা।

বীর পদদাপে সিঁড়ি আর ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে নীচে নেমে গেল কানাই দে। উৎকর্ণ হয়ে দেবীদাস যেন শুনতে লাগল বিলীয়মান শব্দটা। এ জুলুম—অসহ্য জুলুম। থানায় যাত্রা হবে—দারোগাবাবুর সখ। কিন্তু তার জন্যে কী দায় পড়েছে দেবীদাসের যে পঞ্চাশটা টাকা তাকে চাঁদা দিতেই হবে?

বাইরে রৌদ্রতপ্ত পৃথিবী। রিক্ত মৃত্যুপাণ্ডুর বাংলা দেশ। ওদিকে বন্দরের টিনের চালাগুলো ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে থানার লাল টকটকে বাড়িটা, নিষ্প্রাণ মাটির ফাটা বুকের ভেতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডের মতো যেন বেরিয়ে এসেছে একটা রক্তজবা। সেদিকে তাকিয়ে দেবীদাস যেন উদ্দীপ্ত হয়ে গেল।

—জানিস গৌর, থানার বাড়িটার রঙ অত লাল কেন?

খবরের কাগজে হাঁপানির মহৌষধের বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে গৌরদাস সবিস্ময়ে মাথা তুলে তাকালো।

—জানিস কেন এত রাঙা হয়েছে? রক্তে।

—বটে! এবার গৌরদাস সত্যিই হাঁ করে চেয়ে রইল। দেবীদাসের মগজেও রস-কস বলে কিছু একটা ব্যাপার আছে তাহলে। শচীকান্তের মহিমা আছে সত্যিই। মূকং করোতি বাচালং—।

দেবীদাসের সাদা বাড়িটা সম্বন্ধে মানুষের হাড় জাতীয় একটা তুলনা গৌরদাসের মনে এসেছিল। কিন্তু বলতে ভরসা হল না। কাকার আশ্রয়ে মানুষ, কাকার অনুগ্রহেই কলেজে পড়বার সুযোগ

পেয়েছে। সংক্ষেপে ছোট্ট একটা হুঁ দিয়ে সে পাকা চুল কাঁচা হাওয়ায় একটা যুগান্তকারী বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল।

অনেক দূর থেকেই যাত্রার আসরের আলোগুলো চোখে পড়ছে। অতগুলো ডে-লাইট একসঙ্গে কোথাথেকে যে জোগাড় করা গেল একমাত্র সর্বশক্তিমান শচীকান্ত বলতে পারে সে কথা। কেরোসিনের অভাবে আজকাল অন্ধকারেই তলিয়ে থাকে গ্রামগুলো। বাঁশবনের ছায়ায় জংলাপথের পাথুরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকাল চলাফেরা করে—মানুষ, শেয়াল আর সরীসৃপ। কার মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎটা যেন আদিম একাত্মতায় ফিরে গেছে। রোজ দু'তিনটে করে সাপে-কাটার এজাহার আসে থানাতে,—মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর হিংসা যেন নির্মম হয়ে উঠেছে। ওদিকে মুচিপাড়ায় একটি মেয়ে চীৎকার করে কাঁদছে, পরশু দিন নিশুত রাত্রে ওর ঘরের বেড়া ভেঙ্গে শেয়ালে ছেলে চুরি করে নিয়েছে। পরদিন সকালে বাড়ী থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচান গেল না।

যাত্রার আসরের আলোগুলো অস্বাভাবিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে। প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত তার রেশ এসে পড়েছে—আকাশের অনেকটা শাদা হয়ে গেছে বিচিত্র একটা আলোর কুয়াশায়। গৌরদাসের হঠাৎ মনে হলো শচীকান্ত যেন ক্ষতিপূরণ করতে চায়। এদিনের সঞ্চিত অন্ধকারকে পাঁচ পাঁচটা জোরালো ডে-লাইটের আলো ছড়িয়ে যেন দূর করে দেবার সঙ্কল্প করেছে সে।

আসরের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কালো কালো মানুষের

দল। এত ঝাঁঝালো আলো ওদের চোখে সহ্য হচ্ছে না—ধাঁধাঁ লেগে যাচ্ছে যেন। রাশি রাশি আলোয় ওদের চোখের নীচে কালো কালো ছায়াগুলো আরো বেশী কালো হয়ে পড়েছে, বুকের হাড়গুলো জ্বলে উঠেছে ঝক্‌ঝক্ করে। গৌরদাস ভাবতে লাগল শরীরী দেহ ছাড়িয়ে লোকগুলো যেন অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করছে—সর্বাঙ্গ থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে আত্মিক একটা জ্যোতির্ময়তা।

শচীকান্তের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ যেন তার মেয়ের বিয়ে। সৌজন্য এবং অমায়িকতার বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

—ওরে বোস, বোস তোরা—বসে পড়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই ত' গান—তোদেরই তো জন্যেই দেড়শো টাকা খরচা করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম। নে—বসে পড়্।

সদাশয়তার সীমা নেই। অর্ধনগ্ন অর্ধভুক্ত মানুষগুলো যেন কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না।

শচীকান্তর আদ্দির পাঞ্জাবীটা হাওয়ায় উড়ছে। যুদ্ধের বাজারে অমন চমৎকার আদ্দি কোথায় পাওয়া গেল—সে রহস্য দেবীদাস জানে। একটা প্রফিটিয়ারিংয়ের মামলার জাল কেটে বেরুতে একখান আদ্দি খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু শচীকান্তকে মানিয়েছে বেশ—যেন দশ বছর বয়স কমে গেছে।

—বসুন, বসুন দেবীদাস বাবু, বোসো হে গৌরদাস। না, না, বেঞ্চিতে নয়—এই তো চেয়ার! তারপর কানাই, ওদের আর দেরী কত?

কানাই দে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছে না। ঘর্মাক্ত দেহে প্রাণপণে একটা আলোকে পাম্প করছে সে। মুখ ফিরিয়ে শশব্যস্তে

জবাব দিলে, আর বেশী দেরী নেই বড়বাবু, ওদের সাজ হয়ে গেছে। নারদ এসে পড়বে এক্ষুনি।

রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছলেন শচীকান্ত। ক্লান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর এসে বসলেন দেবীদাসের পাশের চেয়ারটাতে। মদ আর সিগারেটের একটা মিলিত গন্ধ অনুভব করলে দেবীদাস।

আসরে বেহালার ছড়ে টান পড়েছে। টুম্ টুম্ করছে তবলা। থেকে থেকে ঝমর ঝমর করে উঠছে করতাল। সব মিলে বেশ একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কালি-পড়া কোটরের ভেতর থেকে চক্‌চক্ করে উঠ্‌ছে কালো মানুষগুলোর চোখ। সমস্ত দিনের অতি-বাস্তব সংঘাতের পরে একটি রাত্রের মায়ালোক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা দেবীদাসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন শচীকান্ত।

—দুঃশাসনের রক্তপান লাগিয়ে দিলাম। ভালোই হবে—কী বলেন সরকার মশাই?

আপ্যায়িত হ'য়ে দেবীদাস হাসল: আজ্ঞে হাঁ ভালো হবে বৈকি!

বেহালার ছড়ে সুরের আবেশ এসেছে। তবলায় তাল পড়ছে। তারপরেই আসরের পেছন থেকে গানের আওয়াজ। হস্তিনাপুরে রাজসভার নর্তকীদের প্রবেশ। ঘুঙুরের শব্দে আর গানে যেন ঝড় বয়ে গেল।

শচীকান্ত বললেন, সাবাস্ ভাই। গলার স্বরে জড়তা। নেশাটা বেশ ভালো করে জমে উঠছে। দেবীদাসের দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে?

দেবীদাস সংক্ষেপে বললে, বেশ।—মনের মধ্যে পঞ্চাশটা টাকার

শোক তখনও কাঁটার মতো বিঁধছে। কিন্তু এ কথা সত্যি যে, দলটা ভালো গায়। শচীকান্তর রুচি আছে।

সমস্ত পৃথিবীটা বদলে গেছে মুহূর্তে। আলো আর গানে বাঙলা দেশের ছোট এই গ্রামটা হাজার হাজার বছর আগেকার কুরুক্ষেত্রে ফিরে চলে গেছে। অর্জুনের কপিধ্বজ রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কৌরব সৈন্য—পাঞ্চজন্যের শব্দে—দূর রাজপ্রাসাদে বসে থর থর করে কেঁপে উঠছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। কর্ণ এসে বলছেন: ভয় নেই। সূতকুলে আমার জন্ম—সে জন্যে দায়ী দৈব। কিন্তু আমার পৌরুষ—সে আমার নিজস্ব গৌরব।

শচীকান্ত বললেন, বাঃ বাঃ কর্ণ বেড়ে এ্যাক্ট্ করছে। ওকে একটা মেডেল দিতে হবে সরকার মশাই।

ইতিহাস চলেছে বজ্রগর্জিত ঝড়ের আবেগে! রক্ততরঙ্গিত কুরুক্ষেত্র। একটির পর একটি মহারথী বীরশয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শকুনির হাতের পাশা আজ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমুকুট নিয়ে জুয়া খেলছে। আত্ম-গ্লানিতে পীড়িত হয়ে দুর্যোধন বলছেন: মাতুল, তোমার জন্যেই আজ আমার এই সর্বনাশ হল!

শচীকান্ত ঝিমুতে ঝিমুতে বললেন, না, দুর্যোধনটা কোন কাজের নয়। মুখটা বড্ড বেশী বোকাটে।

ওদিকে দ্রৌপদীর চোখে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে আগুন। অযত্ন-বিন্যস্ত রুক্ষ-চুল তাঁর সর্বাঙ্গে যেন প্রলয়ের মেঘের মতো ভেঙে পড়েছে। সেই দীপ্ত নারীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দিগ্বিজয়ী অর্জুন পর্যন্ত সলজ্জ দীনতায় মাথা নীচু করে আছেন।

—শোন কেশব, শোন ভীমসেন—শোনো ধনঞ্জয়! প্রকাশ্যে রাজসভায় সেই মর্মান্তিক অপমানের পরে শুধু তোমাদের মুখ চেয়েই

পাঞ্চালী আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু আর নয়। দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে যদি বেণীবন্ধন না করতে পারি, তাহলে জেনে রেখো, সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

সমস্ত আসরটা গম্ গম্ করে উঠছে। ঝিমন্ত চোখ তুলে শচীকান্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন। মানুষগুলো সমস্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে—থেকে থেকে বেহালার ছড়ে একএকটা তীব্র আর্তনাদ যেন দ্রৌপদীর বজ্রবাণীর প্রতিধ্বনি করছে।

অদ্ভুত জমেছে গান। দেবীদাস ভুলে গেছে নিজেকে—এমনকি পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিটাও এখন আর তত তীব্র বলে মনে হচ্ছে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলা দেশে। গৌরদাসের মনে হতে লাগল—সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে, আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে? কে বলবে।

শচীকান্তর আদ্দির পাঞ্জাবীটা হাওয়ায় উড়ছে। দীপ্ত হয়ে উঠেছে নেশায় নির্বাপিত চোখ দুটো। ইতিহাসের চাকা চলেছে ঘুরে। ওদিকে রাত শেষ হয়ে গেল। ডে-লাইটের আলোগুলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। ওপাশে নদীর বুক থেকে শির শির করে আসছে শেষ রাত্রির হাওয়া। মানুষগুলোর রাত-জাগা চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু সে চোখ তারা বুজ্‌তে পারছে না। ঘটনার গতি উড়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে—একটুখানি চোখ বন্ধ করলেই তারা পিছিয়ে পড়বে।

শচীকান্ত একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললেন, সাবাস্—সাবাস্।

চরম সঙ্কট মুহূর্ত। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার সময় এসেছে। মানুষগুলো প্রতীক্ষা করছে নিশ্বাস বন্ধ করে। ভীমের গদার ঘায়ে

মাটিতে আছড়ে পড়ল দুঃশাসন। আসরের চারিদিকে কটাকট হাততালি।

কিন্তু বিস্ময়ের আরো বাকী আছে। দুঃশাসনের বুকে বিঁধেছে ভীমের খর-নখর। আর কী আশ্চর্য—ভীমের নখের মুখে উছলে উঠছে রক্ত—হাঁ—রক্তই তো!

সেই রক্ত মুখে মেখে পৈশাচিক মূর্তিতে ভীম উঠে দাঁড়ালো। দর্শকেরা বিস্ফারিত বিহ্বল চোখে তাকিয়েই আছে।

একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করে ভীম বললে: এই রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী বেঁধে দেব। প্রতিশোধ যজ্ঞের প্রথম আহুতি দেওয়া হল আজকে।

দশ মিনিট ধরে টানা হাততালি। শচীকান্ত চেয়ারের হাতল ধরে উঠেছেন। আদ্দির পাঞ্জাবীর হাতায় খানিকটা পানের পিক লেগেছে—যেন রক্তের ছোপ। জড়িত গলায় বললেন, চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার! সরকার মশাই, দলকে দল একটা করে মেডেল দিয়ে দিন। সাবাস্ ভাই সাবাস্।

বেহালা ফেলে অধিকারী উঠে এল তড়িৎগতিতে। আভূমি নমস্কার করে বিগলিত হাস্যে বললে, হুজুরের অনুগ্রহ।

ভোরের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে পৃথিবী। সারারাত জেগে বসে থেকে সমস্ত শরীর আড়ষ্ট আর অসাড় হয়ে উঠেছে। মস্ত একটা হাই তুলে দেবীদাস বললে, চল গৌর, যাওয়া যাক্।

ধূলোয় ভরা পথ দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। ধানকাটা মাঠ থেকে হাওয়া এসে খেলা করছে গৌরদাসের বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে। দেবীদাস অন্যমনস্কের মতো বললে, বেশ গাইলে, না-রে?

—হাঁ।

একটু এগিয়ে মুচিপাড়া। পুত্রহারা মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে এখনো। তার ছেলেকে চুরি করে খেয়েছে শেয়ালে, আর খেয়েছে তার ঘরের পাশে বশেই। আকাশভরা এত আলো—এমন অকৃপণ সূর্য। রাত্রির অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে যায় এই আলো ? এই সূর্য ডুবে যায় কোন্ অতল সমুদ্রে ?

দেবীদাস বললে, চল, লক্ষ্মণ মুচিকে একটা ডাক দিয়ে যাই। দুজোড়া জুতো পাঠিয়েছিলাম—দিয়ে গেল না তো।

ওরা মুচিপাড়ায় পা দিতেই তিন-চারটে কুকুর চীৎকার করে উঠল তারস্বরে। প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ডোবায় গিয়ে নামল কতগুলো পাতিহাঁস। প্রকাণ্ড একটা মাটির গামলায় নীল জল, চামড়া ধোয়া গন্ধ উঠছে তার থেকে। কতগুলো ছোটবড় চামড়া ট্যান করবার জন্যে ছোট ছোট বাঁশের খুঁটো দিয়ে আঁটা। মুচিদের ভাঙা ঘরগুলো ভগবানের দয়ার ওপরে আত্মসমর্পণ করে বেঁকে চুরে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ আছিস ?

ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর এক সঙ্গেই চম্‌কে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি—ছলছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনখানে এক ফালি কাপড় নেই—কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।

ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত নারীকণ্ঠ শোনা গেল : লক্ষ্মণ বেরিয়ে গেছে।

—ওঃ আচ্ছা।

দুজনে আবার নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। গৌরদাসের মনে হল : যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?

রাত্রি জাগরণে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুত বিষন্ন আর পাণ্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙ্গা আলের উপর দিয়ে একদল লোক কাজ করতে চলেছে—তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে—অত্যন্ত অকারণে বড় বেশী ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন ঝক্‌ঝক্ করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?

কালো জল

লম্বা কালো চেহারার মানুষটা। নাক দুটো একটু চাপা বলে গলার স্বর খানিকটা আনুনাসিক হয়ে বেরিয়ে আসে। সমস্ত শরীরটায় বাড়তি কিছু নেই, যেন রাশি রাশি পেশীর সমষ্টি। পূর্ব বাংলাতেও আজকাল অসম্ভব ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কচুরিপানার অত্যাচারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। তাই বায়ান্ন বছর বয়সেই জীর্ণতা দেখা দিয়েছে শীতলের দেহে। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে লজ্জায় শীতলের মাথা নত হয়ে আসে। বায়াত্তর বছরেও কী চেহারা ছিল তার, আর কী শক্তি। ভোলার ঝড়ে যদি সে ঘর চাপা পড়ে না মরত, তাহলে আরো দশ বারো বছর সে যে আরো বে-ওজর বেঁচে থাকতে পারত তাতে আর সন্দেহ কী।

নৌকার হাল ধরে এলোমেলো ভাবে কত কী ভেবে চলে শীতল। আড়িয়াল খাঁর শাদা জলে পশ্চিমের রাশি রাশি বাতাস বৃষ্টি-বিন্দুর মতো জলের কণা উড়িয়ে দিচ্ছে—যেন সৃষ্টি হয়েছে স্পর্শ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণিপাক। হালকা একটুকরা মেঘে নদীর এদিকটায় ছায়া পড়েছে, বাঁকের ওপারে খররৌদ্রে ঝলমল করছে জল, খালের মুখে কচুরিপানার সবুজ ছোপ—নদীটা যেন বহুরূপী। পলি মাটির জমিতে বৈশাখী মেঘের রঙধরা পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে জোয়ারের জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

এই পথ—কতদিনের চেনা পথ। ফরিদপুর থেকে, মাদারীপুর থেকে কতবার সে সোয়ারী নিয়ে গেছে এই পথ দিয়ে। কতবার বৈশাখী ঝড় আর জলের রাক্ষস উল্লাস তার নৌকাখানাকে নাচিয়েছে খেলার খেয়ালে। চোখের সামনে ষ্টিমারের ঢেউ লেগে নৌকো ডুবে গেছে, শুনেছে দূরের অন্ধকারে ডাকাতের আক্রমণে অসহায় নৌকোযাত্রীর আর্তনাদ। তবু কী চমৎকার গেছে সে দিনগুলো। পূজোর সময় পরদেশীরা ঘরে ফিরেছে, হাসি আর গানে মুখর হয়ে উঠেছে নদীর জল, বাঁশীতে ভাটিয়ালীর সুর মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। বাইচের নৌকায় ঝমঝম করে করতাল বেজেছে—উঠেছে উদ্দাম চীৎকার! গ্রামের হরিসভা থেকে কীর্তনের সুর এসেছে, গাঁটছড়া বাঁধা বরকনে নিয়ে আনন্দিত মুখে গাঁয়ের মেয়েরা "জলসই" করতে এসেছে গাঙের ঘাটে। কিন্তু এই তিন বছরে কোথা থেকে কী হয়ে গেল সমস্ত।

—ও মাঝি, আর কয় বাঁক?

ঘুম থেকে উঠে একটা বিড়ি ধরিয়েছে সোয়ারী তারাপদ। উৎসুক ব্যাকুল চোখ বাইরে নদীর দিকে মেলে দিয়ে বলছে, সন্ধ্যার আগে পৌঁছে দিতে হবে যে।

মেঘের ছায়াটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে—যেন একটা বিরাট পাখী সূর্যের ওপর থেকে ডানার আড়াল সরিয়ে নিয়ে ভেসে গেল দিগন্তের দিকে। শীতলের পাকধরা চুলগুলো চিকচিক করে উঠল, ঘর্মসিক্ত চওড়া কপাল জ্বলে উঠল জ্বল জ্বল করে।

—ভাঁটায় বড় জোর টান দিয়েছে বাবু। পালের ওপর তো চলছি, বাতাস ঠিক থাকলে সন্ধের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারব।

কথায় মন মানতে চায় না, পথ কি সোজা নাকি।—নইলে

গুণ টেনে চল্‌না বাপু।—তারাপদ অধৈর্য হয়ে উঠেছে: সাঁঝের ভেতর না পৌঁছুলে আমার চলবে না।

—গুণ টানার এখন দরকার হবে না বাবু।—শীতল হাসল।—বাতাস পড়ে গেলে টানব তখন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

কিন্তু স্থির হয়ে বসবার জো কোথায় তারাপদর। মনটা যদি পাখী হত তা হলে কখন হাওয়ার আগে উড়ে যেত সে। মানুষ না হতে পারলে দেশে ফিরব না—উত্তেজিত তারাপদ নাটকীয় ধরণে আস্ফালন করে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তাই বলে সম্পূর্ণ নাটকীয় নয়, অভিমান এবং অপমানবিদ্ধ অবস্থায় সে দিন আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তার।

ভয়ার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে?

—চুলোয়।

—বালাই ষাটষাট। কবে আসবে?

—তোমরা মরলে।

এবার আর ষাট ষাট বলেনি অরুণা। হয় তো নিজের মৃত্যুই কামনা করেছিল, এ অপমান আর লাঞ্ছনার জন্যে নিজেকেই ষোল আনা দায়ী ভেবেছিল হয়তো। তাই ময়লা শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে বলেছিল, আমি তোমার পথে কাঁটা দেব না বেশিদিন, কিন্তু মেয়েটাতো কোনো দোষ করে নি।

তারাপদ সে কথার কোন জবাব দেয়নি। সমস্ত মাথাটা যেন বিস্ফোরকে পূর্ণ হয়ে আছে, জবাব দিতে গেলেই যেন ভয়ংকর একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। নিরুত্তরে সুটকেশটা হাতে করে সে নৌকায় এসে উঠেছিল।

হুঁকো হাতে শ্বশুর জানকী চক্রবর্তী বেরিয়ে এসেছিলেন। অল্প বিষন্ন হেসে বলেছিলেন, ঘরে বসে তাস পাশায় সময় না কাটিয়ে চাকরী বাকরীর চেষ্টা করাই ভালো। পৌঁছেই চিঠি দিয়ো বাবাজী।

তখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, লগির খোঁচায় চক্রবর্তী বাড়ীর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। মুখ বার করে কঠিন তিক্ত গলায় তারাপদ জবাব দিয়েছিল, হাঁ আপনার আধসের চালের সাশ্রয় করে দিয়ে গেলাম।

জানকী চক্রবর্তী কী জবাব দিয়েছিলেন তা শোনা যায়নি। শুধু চোখে পড়েছিল, ঘাটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তারপরে তারাপদ চলে গেল পশ্চিমে। শুধু পশ্চিম নয়, পশ্চিম ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। দিল্লী, লাহোর, লয়ালপুর। আত্মীয় নেই, পরিচিত নেই, সহায় সম্বল কিছু নেই। শ্যামশ্রীহীন রুক্ষ কঠিন মাটি, আগুনের পিণ্ডের মতো সূর্য, উত্তপ্ত লুয়ের ঝাপটা, পাঞ্জাবের শহরে দুর্গন্ধ নোংরা গলি। কত দিন কেটে গেছে অনাহারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুসময় এলো। একটা পশমের কারখানায় ছোট মতো একটা চাকরী জুটেছিল—এই পাঁচ বছরে মাইনে দাঁড়িয়েছে দেড়শো টাকায়। আজ অন্তত তারাপদ কারো মুখাপেক্ষী নয়, অন্তত অরুণাকে কাছে নিয়ে গিয়ে দুটি খেতে দেবার মতো সংগতি তার হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছে বাংলা দেশের শ্যামল মাটি, নদীর গেরুয়া জল, স্নিগ্ধ আকাশ। তাই এক মাসের ছুটিতে দেশে ফিরছে তারাপদ। জলে স্থলে বাংলার স্নেহ গভীর স্পর্শ যেন তাকে আকুল করে দিয়েছে।

আর ক্রমাগত অরুণার কথা মনে পড়ছে, জেগে উঠছে একটা

অতি তীব্র অনুতাপ বোধ। এতটা করবার কী দরকার ছিল। তা ছাড়া অরুণা কোনো দোষ করেনি। কোনোদিন একটি কথা বলেনি সে। শ্বশুরের অন্নে দিন যাপনের গ্লানিকে তারাপদর জীবনে যথাসম্ভব সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টাই বরং সে করেছে। তবু কেন অরুণাকেই সে আঘাত করল সব চাইতে বেশি, কেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি লিখেও তাদের খোঁজ নেয়নি? কী যেন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল, অপমানিত পৌরুষের কোন্ কেন্দ্রবিন্দুতে ঘা লেগেছিল একটা। আজ তার জন্যে সে অনুতপ্ত, ক্ষতিপূরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করবে।

—ও মাঝি, সাঁঝের আগে কি কিছুতেই পৌঁছোনো যাবে না? হাওয়াতো তেমন জোর ঠেকছে না। নইলে গুণই নাও না।

শীতল আবার হাসল।

—ব্যস্ত হবেন না বাবু, গুণের সময় হয়নি এখনো।

পাড়ের দিকে একবার তাকাল শীতল। খাড়া পাড় প্রায় আট দশ হাত ওপরে উঠে গেছে পাহাড়ের মতো—থেকে থেকে ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছে মাটির চাঙ্গাড়—খানিকটা ঘোলা জল ঘুরপাক খেয়ে উঠছে ঘূর্ণীর মতো। আড়িয়াল খাঁর শ্রান্তিহীন ভাঙন। এদিকের একটা গ্রাম প্রায় আদ্ধেকের বেশি নদীর জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, দু তিনটে পত্রহীন শুকনো নারকেল গাছ এখনো জলের মাঝখানে তির্যক রেখায় দাঁড়িয়ে স্রোতের টানে থর থর করে কাঁপছে। উঁচু পাড়ের এখানে ওখানে খাঁড়ির মতো হয়ে নদীর জল ঢুকে গেছে —মাটির গায়ে অজস্র ফাটল, কাঁটা গাছ আর হিজলের ঘন সারি

দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। ওখানে গুণ নিয়ে নামা অসম্ভব। কিন্তু তারাপদর তাগিদ অত্যন্ত বেশি, বড় বেশি স্বার্থপর মানুষের মন।

তারাপদর দোষ নেই অবশ্য। বহুদিন পরে সে ফিরছে—দূরপ্রবাসীর এই স্বার্থব্যাকুল মনোভাব অপরিচিত বা অস্বাভাবিক নয় শীতলের কাছে। আজ পঁচিশ বছরের ওপর সে মাঝিগিরি করছে, মানুষের এই দুর্বল ব্যগ্রতা বিরক্তি জাগায় না তার—সহানুভূতিই আকর্ষণ করে বরং।

কিন্তু এই নদী—এই গ্রামগুলো। তিন বছরে কী আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পরে গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। শ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে। চরের ওপরে ওই বাড়িগুলো থেকে কীতর্নের স্বর এসেছে কতদিন, এসেছে রয়ানী গানের উত্তাল কণ্ঠ। কিন্তু দু’বছরের মধ্যেই সব আশ্চর্যভাবে নীরব আর নিঃসাড় হয়ে গেছে। মানুষ যারা আছে তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়হীন ছায়ামূর্তি মাত্র।

হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে পালের মুখটা বদলে দিলে শীতল।

—কদ্দিন পরে দেশে আসছেন বাবু?

কদ্দিন? সে অনেক দিন হল বই কি—পাঁচ বছর।

—দেশের কিছুই জানেন না বুঝি?

—নাঃ।—তারাপদ ভ্রু কুঞ্চিত করলে, না, বিশেষ কিছুই—!

এদিকে খুব দুর্ভিক্ষ গেছে না মাঝি? কাগজে যেন দেখছিলাম। আচ্ছা, মধু গাঁয়ের কোনো খবর জানো তুমি?

না, শীতল জানে না। না জানলেও কিছু অনুমান করা কঠিন নয় তার পক্ষে। কিন্তু কী হবে সে কথা তারাপদকে বলে। দুঃসংবাদ দিয়ে তার লাভ কী। তা ছাড়া তারাপদ হয়তো বড়লোক। হয়তো তার আত্মীয়স্বজন সুখেস্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়ে চলেছে। দেশের সব লোকই তো আর না খেয়ে মরেনি। কত মানুষ তো এই ফাঁকে দস্তুর মতো রাজা বাদশা বনে গেল।

অন্যমনস্কের মতো তারাপদ আবার বললে, গুণটা টেনে গেলে—

শীতল সে কথার জবাব দিল না।

বাঁকের পর বাঁক। পথ যেন আর ফুরোয় না। ভাঁটার টান প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসছে, পালের বাতাস মন্দা। শুধু খাড়া পাড়ের গায়ে নদীর অচেতন হিংসা আঘাত করে যাচ্ছে। ঝুপঝাপ শব্দে অবিশ্রাম ভাঙন। ঘোলা জলে এক রাশ ফেনা ফুটে উঠছে, তারপরেই ছিন্ন মালা থেকে ছড়ানো রাশি রাশি ফুলের মতো খরস্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। তারাপদর নৌকোর ওপর একটা কাক বারকয়েক অকারণে চক্র দিয়ে কা কা করে উড়ে চলে গেল।

অসীম বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা নিয়ে একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলল তারাপদ। মাঝিটার যেন গরজ নেই কিছু, গুণ টেনে গেলে এতক্ষণ—! কিন্তু বলে বলে হয়রাণ হয়ে হয়ে গেল সে। এত স্বার্থপর হয় মানুষ। একটুখানি গা ঘামালে এমন কি ক্ষতি হতে পারত লোকটার; পাঁচ বছর পরে সে দেশে ফিরছে অথচ যেন কোনো তাগিদ নেই, এতটুকু সমবেদনা নেই তার জন্যে।

অরুণা কী করছে এখন! হয়তো বিকেল বেলায় গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে খিড়কির ঘাট থেকে ঘরে ফিরছে। বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে জানকী চক্রবর্তী পাশার আসরে মেতে উঠেছেন। বড়শালা এইমাত্র হুইল আর তিনটে মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। মেয়েটা হয়তো দাদুর কোলের কাছে বসে তাঁর গুড়গুড়ির নলটা নিয়ে খেলা করছে।

বুকের ভেতরে চনচন করে উঠল, মনটা আর বাঁধন মানতে চায় না। নদীতে আজ কি আর জোয়ার আসবে না? অথবা এই পাঁচ বছরে বদলে গেছে সমস্ত, শুধু ভাঁটাই আসে আজকাল, জোয়ারের টান বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে?

—ও মাঝি?

—আর দেরী নেই কর্তা। সামনের বাঁক ঘুরলেই খাল ধরব।

সামনের বাঁক, সামনের বাঁক। তারাপদর ইচ্ছে করল মাঝিটাকে কষে একটা চড় বসিয়ে দেয়। লোকটা যেন ইয়ার্কী করছে তার সঙ্গে। ওদিকের রোদের রঙ রাঙা হয়ে উঠেছে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, পূবের আকাশে কে যেন হালকা তুলি দিয়ে ছায়ার রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যা আসছে। অথচ—

সামনের বাঁক। সামনে তো যতটা চোখ যায় ধূ ধূ করছে সোজা নদী, তারপর ওই দিকচক্রবালে—যেখানে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না, ওখানে ওইটেই বাঁক নাকি। তাই হয় তো হবে। কিন্তু ওখানে যেতে যেতেই তো সন্ধ্যা লেগে যাবে। তারাপদ বিরক্ত ও হতাশ মনে আর একটা বিড়ির জন্যে সার্টের পকেটে হাত ঢোকালে, কিন্তু সময় বুঝে বিড়িগুলোও ফুরিয়ে গেছে সব।

ক্লান্তি আর বিরক্তিতে বালিসে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে।

উজ্জ্বল নীল আকাশ। রাজহাঁসের পাখার মতো মেঘের রঙ। হাল ধরে শীতল বসে আছে স্থির। নদীর জল বয়ে চলেছে কলকল করে। ওই আকাশটার দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ জুড়ে এল, তারাপদ আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

—উঠুন বাবু, এই তো ঘাট।

এক লাফে তারাপদ উঠে বসল। এতক্ষণে তাহলে পথ সত্যিই ফুরিয়েছে। যেন বিশ্বাস হতে চায়না সহজে: মধু গাঁয়ের চক্কোত্তি বাড়ির ঘাট?

—হাঁ বাবু।

—তা হলে—সার্টটা গায়ে চড়িয়ে লাফিয়ে তারাপদ নেমে পড়ল—হাঁটু পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেল কাদায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললে, আমি এগোই, তুমি জিনিষপত্তরগুলো নিয়ে এসো।

তারাপদ যেন হাওয়ার আগে উড়ে চলে গেল। এই তো চক্রবর্তী বাড়ি। সন্ধ্যার অন্ধকারে সব যেন থম থম করছে! সুপুরী গাছের ঘন ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে আছে ম্লান আর নিরানন্দ অন্ধকার। এই সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে একটাও আলো জ্বলে না কেন? চণ্ডীমণ্ডপটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার অন্ধকার কোন থেকে একটা তক্ষক আকস্মিকভাবে তারাপদকে অভ্যর্থনা করে উঠল: ঠক্-কো ঠক্-কো —ঠক্ কঁ-অঁ-অঁ—

বাড়ি ভুল হয়নি তো! না, কেমন করে হবে? এই তো সামনে বড় গাব গাছটা, ওই তো পশ্চিমের ঘর—তবে?

—অনন্ত দা, অনন্ত দা! ও ভুনি! এই সন্ধ্যাবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সমস্ত?

পশ্চিমের ঘরে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। কাঁপা বিরক্ত গলায় কে বললে, এখন আবার কে ডাকাডাকি করে। আমার জ্বর এসেছে, বেরোতে পারব না।

—আমি তারাপদ।

—কে, কে?

—তারাপদ।

—তারাপদ!—একটা আর্ত প্রতিধ্বনি, পরক্ষণেই আবার নিঝুম মেরে গেল সমস্ত। দ্রুত হুড়কো খোলার একটা শব্দ হল, একটা মাটির প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এল বড় শালা অনন্তের স্ত্রী প্রতিমা। নিরাভরণ হাত, ছিন্ন শাড়ীর অন্তরালে একটা কংকালসার দেহ, প্রতিমা নয়, প্রেতিনী। দরজার গোড়ায় অনন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, গায়ে একটা কাঁথা—প্রদীপের আলোয় তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তারাপদর চোখে পড়ল।

—এতদিন পরে এলে ভাই! কেন এলে? একটা বুক ফাটা কান্নায় প্রতিমা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে নিবে গেল। বাড়ির পেছনে গাব গাছ থেকে প্যাঁচা ডাকতে লাগল: নিম্‌-নিম্‌-নিম্‌—

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব শুনে গেল তারাপদ। কলেরায় মারা গেছেন জানকী চক্রবর্তী। ভুনি একদিন বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রী করে দিয়েছে। আর অরুণা! পেটের ভাত আর পরণের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না।

আশ্চর্য, তারাপদ তবু সোজা দাঁড়িয়েই রইল। মাটিতে পড়ে গেল না, মাটিতেই বা তার অবলম্বন কোথায়। শুধু পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল, আর পেছনে শীতলের ছায়া মূর্তিটা অনুভব করে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—তুই যা মাঝি। সিধে আর তোকে দিতে পারব না।

—ভাড়া তো আট টাকা ঠিক হয়েছিল বাবু। আমার কাছে খুচরো নেই।

—থাক, ওই দশ টাকাই তুই নিয়ে যা।

সমস্ত নাটকটার নীরব এবং একমাত্র দর্শক শীতল নিঃশব্দে অভিশপ্ত চক্রবর্তী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এমন সে আরো দেখেছে দু চারবার। কিন্তু আজ যেন বুকের মধ্যে বড় বেশী দোলা লাগল, বড় বেশী করে মনের সামনে ভাসতে লাগল তারাপদর বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টি—যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শীতলও তো এক মাসের মধ্যে দেশে যায় নি, তার পরিবার পরিজন—!

অন্ধকার গাব গাছটার তলা দিয়ে আসতে আসতে সে শুনতে পেল মাথার ওপরে অলক্ষণে প্যাঁচাটা তখনো কঁকিয়ে চলেছে নিম্ নিম্ নিম্। আর কী নিবি, নেবার আছেই বা কী। অহেতুক বিদ্বেষে একটা মাটির চাঙাড় কুড়িয়ে নিয়ে সে প্যাঁচাটার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলে, ঝটপট শব্দে একটা ছোট কালো পাখী খাল পার হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল। পেছন থেকে তখনো কান্নার সুর আসছে : এতদিন পরে কেন এলে ভাই, কেন এলে ?

আর মনে পড়ে গেল পলাশপুরের দত্ত বাড়ির ছোট বউকে। স্বামীর অসুখের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল শীতলের নৌকোতেই। বয়স অল্প, স্বামীর অসুখের সংবাদেও তার কচি কোমল

সুন্দর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপটা গাঢ় হয়ে পড়েনি। আশায় আনন্দে তখনো উচ্ছল, মাথায় টকটকে সিন্দুরের ফোঁটা, গায়ে রাশি রাশি গয়না। অসুখ মানুষের হয়, আবার সারেও তো। মাঝে মাঝে খুসি মনে ছোট ছোট শাদা আঙুল দিয়ে খালের জল নিয়ে খেলা করেছিল, পান খেয়ে আরো রঙিণ করেছিল রঙিণ ঠোঁট দুটি—একেবারেই ছেলেমানুষ! তারপর বাড়ির ঘাটে যখন নৌকো ভিড়েছিল, তখন দেখেছিল সামনের ভিটা বাড়িতে একটা চিতা জ্বলছে, তার স্বামীর চিতা।

লগির খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে চক্রবর্তী বাড়ির ঘাট থেকে বের করে নিয়ে এল। বাজারের নীচে রান্নাবান্না করে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার রওনা দেবে শেষ রাতে। সারা গায়ে অসীম ক্লান্তি এসে বাসা বেঁধেছে যেন। মাত্র বায়ান্ন বছর বয়েস, এর ভেতরেই এত বুড়ো হয়ে গেল শীতল। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে—

খালের দু বাঁক উজানে নামতেই মধু গাঁয়ের বাজার। আলো নেই, মানুষ নেই, চক্রবর্তী বাড়ির মতোই ঝিম মেরে পড়ে আছে। খোঁজ করতে গেলে বাজারে হয়তো কিছুই মিলবে না। চাল নয়, তেল নয়, একটুখানি নুনের ভাবনা ভাবা তো পাগলামি মাত্র! আর এই বাজার! পাঁচ বছর আগেও শীতল একে দেখেছে, আলোর ঝলমল করত, হঠাৎ দেখলে ভুল হত শহরের বাজার বলে। সেদিন আর এদিন।

সঙ্গে যা ছিল তাই দিয়েই চালে ডালে পেঁয়াজে খানিকটা খিচুড়ি রাঁধলে শীতল। কিন্তু আশ্চর্য, একটা দুটো গ্রাস মুখে দিয়েই আর সে খেতে পারল না। অনিচ্ছুক শরীর, অনিচ্ছুক মন। কেবলই যেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাপদ বিহ্বল মুখখানা।

এক পেট জল খেয়ে হাঁড়িটাকে সে ঢেকে রাখল। নৌকো ছাড়বার আগে খেয়ে নিলেই চলবে। ক্লান্তির বোধ হয় এত খারাপ লাগছে তার। একটু ঘুমিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

খালের ওপরে বাজারটা নিস্তব্ধ। শুধু নৌকোর তলা দিয়ে কলকল করছে কালো জল—মাথার ওপর দিয়ে পাখা মেলে মেলে উড়ে চলেছে রাত্রির পাখি। বাতাসটা ঠাণ্ডা নয়—খানিকটা উত্তপ্ত বাষ্পের মতো, যেন কারো নিঃশ্বাসের মতো গরম। পূর্ব বাংলার শ্মশানে যেন প্রেতের উষ্ণ নিঃশ্বাস। শীতলের গায়ের মধ্যে ছম ছম করতে লাগল।

তবু ভালো, বাজারে এখনো মানুষ আছে, বেঁচেও আছে। একটি কোমল কিশোরী কণ্ঠে 'মনসা-মঙ্গলের' কয়েকটি পংক্তি ভেসে এল কানে :

"বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও, ত্রিভুবন রক্ষা করো ত্রিভুবনের মাও"—

গলার স্বরে করুণ কাতরতা। যেন এই বাজারটা, এই গ্রামটা সমস্ত দেশটাই অসহায় স্বরে কেঁদে উঠছে, বাঁচাও আমাদের, বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও। কিন্তু ত্রিভুবন কি সত্য সত্যই রক্ষা পাবে? আকাশের নীচে এই জমাট কালো অন্ধকার ভেদ করে সে প্রার্থনা কি গিয়ে পৌঁছুবে দেবতার কানে। কে বলবে।

অনেক রাত্রে একটা লণ্ঠনের আলো পড়ল চোখের ওপর। যেন চাপা গলায় ডাকছে।

—ও মাঝি, ও মাঝি, ভাড়া যাবে?

আঃ, কে বিরক্ত করে এত রাত্রে। এখন সে কোথাও ভাড়

সুন্দর মা ..রবে না। তারও মানুষের শরীর, তারও তো সুখদুঃখ তথা ..হ।

—না ভাড়া যাব না।

—ও মাঝি, শোনো শোনা। বড় জরুরি। ভাড়া ডবল দেব। বিপদে পড়ে গেছি, উদ্ধার করে দাও একটুখানি। আর শুয়ে থাকা চলল না। অসীম বিরক্তির একটা হাই তুলে শীতল উঠে বসল, কে ?

লণ্ঠন হাতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। যে কথা বলছে তার গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান, ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। ডান হাতে তিনটে আংটি, বাহুতে সোনার তাবিজ, গলায় বেনিয়ানের ভিতরে সোনার এক ছড়া হার চিকচিক করছে। বড়লোক এবং মহাজন নিঃসন্দেহ।

—কী হ'য়েছে বাবু ?

—কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে। এই বেশি নয়, বস্তা দশেক।

—কিন্তু আমার নৌকা তো মালের নয় বাবু, শোয়ারীর।

—জানিরে বাপু জানি।—লোকটা বিরক্ত ভ্রূভঙ্গি করলে : সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। বড় নৌকোয় নেবার যদি উপায় থাকত, তা হলে কি এক মালাই নৌকোর মাঝিদের তোয়াজ করি না তিনগুণ ভাড়া দিই! যত সব অকর্মা ছোকরারা জোট বেঁধেছে, গাঁয়ের থেকে চাল ডাল কিছু নিয়ে যেতে দেখলেই ক্যাঁক করে এসে ধরে। আইনও নাকি হালে কী সব হয়েছে। পয়সা দিয়ে ব্যবসা করব, তবু এসব কিরে বাবা।

—তা আমি কী করব বাবু।

—বেশি কিছু করতে হবে না।—লোকটা এদিকে ওদিকে তাকাল একবার : বস্তা দশেক মাল নিয়ে রাতারাতি, বল্লভপুরের মথুরা দাসের

গোলায় পৌঁছে দেবে। আমিই মথুরা দাস, বুঝেছ। সঙ্গেই থাকব তোমার। খুসি করে ভাড়া দিয়ে দেব, কোন ভয় নেই।

একটা অকারণ নিষেধ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ অন্যায়, এ অত্যন্ত অন্যায়।

—না বাবু, পারব না।

—আরে বাপু, কত তোষামোদ করব আর। ওই যে কথায় বলে, 'মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে'—এও হয়েছে তাই। আর দর বাড়াসনে, গা তোল দয়া করে।

—দেবেন কত?

—দশ টাকা।

—কুড়ি টাকার কম হবে না।

—কুড়ি টাকা! বলিস্ কিরে! —মথুরা দাস চোখ দুটাকে ছানাবড়া করে তুলল: কুড়ি টাকায় তো একখানা নৌকাই কেনা যায়।

—তবে তাই কিনুনগে না।—শীতল আবার শুয়ে পড়বার উপক্রম করল।

—আহা মাঝি শোন শোন—মথুরা দাসের গলায় ব্যাকুলতার আমেজ লাগল: নে ওই পনের টাকাই পাবি, আর দিক করিস্ নে বাপধন। বড় বিপদেই পড়েছি, নইলে—

—কুড়ি টাকার কম পারব না, যদি রাজী থাকেন তো মাল আসুন কর্তা।

—অ্যাঃ, এ যে ভদ্দরলোকের এক কথা। তবু তো ভাগ্যিস্ ভদ্দর লোক নোস। আচ্ছা যা, তাই হবে। বাগে পেয়েছিস কিনা। হুঁঃ, যত সব—

অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনেটুনে শীতল উঠে দাঁড়াল। বাগে

পেয়েছে। সে আর পেয়েছে কতটুকু? তার চাইতে ঢের বেশী পেয়েছে মথুরা দাস। শুধু একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে। শ্মশানের ওপর হাড়ের স্তূপ যত আকাশ ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়ির পাহাড়। আড়িয়াল খাঁ ভেঙে চলেছে দুর্নিবার ভাবে, গ্রামের পরে গ্রাম, নীড়ের পর নীড়, দুর্ভিক্ষে শ্মশান হয়ে চলেছে সমস্ত। আর সেই জনহীন চড়ায় একটা ভাঙা নৌকা উবুড় হয়ে আছে। তা থাক, মথুরা দাসের নৌকোর অভাব হবে না কোন দিন।

তারাপদ কী করেছে এখন? চকিতের জন্যে শীতলের মনে পড়ল: তারাপদ কী করেছে এখন? অন্ধকার উঠোনের মাঝখানে এখনো কি সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কত আশা করেই না এসেছিল লোকটা। দেশে ফিরবার জন্যে কত ব্যস্ততা, কত তাগিদ কতদিন যে সে আপনার জনের মুখ দেখেনি। নাঃ, এমন জানলে কিছুতেই ভাড়া নিতনা শীতল।

—আর কত মাল চাপাবেন বাপু? আমার নৌকা যে ডুবে যাবে।

—যাবে না বাপু, যাবে না। মোটে দশটা তো বস্তা। দু কোশ রাস্তা যাবি, কুড়ি টাকা কবুল করেছি। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—কেউ জিগেস্ করলে—হাঁ, যা বলে দিয়েছি মনে আছে তো?

একবার ইচ্ছা হল টান মেরে বস্তাগুলোকে জলে ফেলে দেয়।

মুখে চোখে জল দিয়ে শীতল নৌকো খুলে দিলে। অন্ধকারে জল বয়ে চলেছে তরল খড়্গের মতো তীক্ষ্ণ খর ধারায়। দুপাশের বন জঙ্গল আর বেত কাঁটায় লগির আগা আঁকড়ে ধরে, কচুরির জাঙ্গাল পথ আটকে নৌকোটাকে বাধা দেয় বারে বারে, যেন যেতে দেবে না। দূরে কোথায় কারা চীৎকার করে কাঁদছে, মড়াকান্না নিশ্চয়।

মৃত্যুর এমন সমারোহের মাঝখানে লোকের এখনো কাঁদবার মতো কণ্ঠ যে অবশিষ্ট আছে এইটেই আশ্চর্য।

আকাশে অনেকগুলো জলজ্বলে তারা একসঙ্গে ছায়া ফেলেছে খালের জলে। জলটা ঝিলমিল করছে যেন বাঘের থাবা। পচা মাটি আর পাতার অত্যুগ্র গন্ধ ভাসছে বাঘের গায়ের গন্ধের মতো। একটা রক্তাক্ত হিংস্র হাসির আভায় দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠল—শেষ প্রহরের খণ্ড চাঁদ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিস্ময়করভাবে কুটিল আর হিংসাতুর হয়ে উঠেছে; রাত্রিটা যেন উঠে এসেছে শ্মশানের কোল থেকে, যেন রাশি রাশি চিতার ধোঁয়ায় রূপ নিয়েছে এই অন্ধকার। আর এই রাত্রিতে মথুরা দাস চাল চুরি করে নিয়ে চলেছে—চুরি করে নিয়ে চলেছে মানুষের মুখের গ্রাস। সমস্ত পরিপার্শ্ব—সমস্ত পটভূমিই তার অনুকূলে।

—নৌকো কার? কোথায় যাবে?

কড়াগলায় প্রশ্ন এল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দুতিনটে টর্চের ঝাঁ ও তাঁর আলো এসে পড়ল শীতলের চোখে মুখে—কী আছে নৌকোয়? আগুনের

নৌকোর ভেতরে ততক্ষণ একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছে মথুরা দাস। ফিসফিস করে ভীরু গলায় বল ভিন আর ও মাঝি? আশেপাশে

—কী আছে নৌকোতে? থামাও, ভিড়াও নৌকো। আর সে

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলে শীতল। আছে,

—শোয়ারী আছে বাবু, ভেদবমি ধরেছে। ভয়ানক বিপদ। তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে না পারলে—

—ভেদ-বমি! টর্চের আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল: মিথ্যে বলছ না তো? মাল-পত্তর নেই তো কিছু? চাল-টাল?

—এসে দেখুন না বাবু।

—আচ্ছা, যাও যাও। বুড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না।

—আজ্ঞে না।

জোরে জোরে আরো কয়েকটা খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল। খালের জলে বাঘের থাবা ঝক ঝক করছে—শেষ প্রহরের লালাভ ম্লানতায় সে থাবার নখগুলো যেন রক্তাক্ত। দিগন্তে চাঁদের রক্ত-হাসি। অন্ধকারটা যেন চিতার ধোঁয়ায় ঘনীভূত।

নিরাপদ জায়গায় এসে মথুরা দাসও হাসতে সুরু করে দিলে। দাঁতগুলো জলে উঠলো উল্লাসে।

—বেড়ে বেড়ে বলেছিস মাঝি। ভেদবমির রুগী! হি-হি-হি! এখন বাকীটা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যেতে পারলে—হি-হি-হি।

শীতলের মনের মধ্যে বার বার করে একটা তীব্র ধিক্কার বেজে কিছু বুড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না। মথুরার হাসির — যেন তার চমক ভেঙে গেল। অবচেতন জিঘাংসার একটা —ং সাড়া দিয়ে উঠল : কথা ক্ষণেও ফলে, অক্ষণেও ফলে। রাস্তা যাই কি এই মুহূর্তে ভেদবমি দেখা দিতে পারে না মথুরার? জিগেস, জলে অতি তীব্র জোয়ার এসেছে। দিনের আলোয় এরাড়িয়াল খাঁর প্রশস্ত প্রসারিত স্রোত নয়—অবিশ্রান্ত পাড় া শ্মশানের উদাস রিক্ততাও নয়। রাত্রির অন্ধকারে খালের শীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষিপ্রগতিতে লুকোতে চলেছে নিজের বিষাক্ত বিবরে।

দুষ্কলা

তর্করত্ন কালীপূজোয় বসেছিলেন।

শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনের জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশ, কোথা থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর যে জল গলানো রূপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রঙ এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে। আর একবার খানিকটা কারণ গলাধঃকরণ করে তর্করত্ন ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকালেন। ওপারের বন জঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে। বাতাসে শীতের আভাস, তর্করত্নের মনে হ'ল তবুও তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলছে, রোমকূপের রন্ধ্রপথে আগুনের কণার মতো বেরিয়ে আসছে ঘামের বিন্দু।

শুক্লা চতুর্দশীর রাতে কালী পূজো—কথাটা শুনতে অশোভন আর অশাস্ত্রীয় ঠেকছে। কিন্তু এ সাধারণ কালীপূজো নয়। আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু! ছ মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো—দিব্যি আছে, কোন রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে। তাই দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে শ্মশানে শ্মশান-কালী পূজোর আয়োজন। অসহায় বিপন্ন মানুষ তিথি-নক্ষত্রের দোহাই মানে না।

পাশেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার শাদা দীপ্তিটা কেমন নীলাভ হয়ে আসছে, তেল ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়। আলোটার ওপরে নীচে নানাজাতের ছোট বড় পোকা এসে জমেছে স্তূপাকারে। তারই অদূরে বসে কাশী কুমোর গাঁজা খাচ্ছে আর গায়ের ওপর থেকে পোকা তাড়াচ্ছে ক্রমাগত।

মুখে থেকে গাঁজার কলকে নামিয়ে কাশী কুমোর বললে, এল ?

অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, নাঃ, কোনো পাত্তাই তো দেখছি না।

কাশী বললে, রাত তো প্রায় কাবার। 'ভোগ হয়ে গেছে কতক্ষণ। ও আজ আর আসবে না।

—আসবে না ? আসবে না মানে ? বীরাসনে বসেও রক্তবস্ত্র-ধারী তর্করত্নের আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে উঠল।

—না এলে কী হবে জানিস ? পুষ্করা পাবে। কারো রক্ষা থাকবে না, তোর নয়, আমার নয়—শ্মশানকালীর খাঁড়ায় কেটে কুটে একজাই হয়ে যাবে সমস্ত। একটি মানুষেরও আর বাঁচবার জো থাকবে না।

কাশী কুমোরের হাত থেকে গাঁজার কলকে খসে পড়ে গেল।

—ডাকো না ঠাকুর, ভালো করে মাকে ডাকো। এতকাল পূজো আচ্চা করলে, এতবড় পণ্ডিত তুমি, আর দেবীকে ভোগ খাওয়াতে পারলে না ? ডাকো, ডাকো, প্রাণপণে ডাকো।

শুকনো মুখে তর্করত্ন বললেন, ডাকছি তো, কিন্তু—

একটু দূরে আধো অন্ধকারের মধ্যে বড় একখানা কলাপাতায় স্তূপাকারে লুচি সাজানো আর খানিকটা মাংস। তার ওপরে বড় একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপবাঁধা খানিকটা রক্তের

মণ্ডপ দেখাচ্ছে। সেদিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তর্করত্ন আবেগ-ভরা কম্পিত গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, দেবি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, জগৎকে রক্ষা করো—

কিন্তু কোথায় দেবী!

নিশিরাত্রের শ্মশান। শুধু শ্মশান বললে কম বলা হয়, এ মহাশ্মশান। অগভীর আর পঙ্কস্রোতা নদীর ধারে ধারে প্রায় তিন মাইল জুড়ে এই শ্মশান ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত যে মড়া এখানে পুড়তে আসে তার হিসেব দেওয়া দুঃসাধ্য। আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার কয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলসী। প্রতি বছর বানের সময় নদী পাড় ভাঙে, মুছে নিয়ে যায় অসংখ্য চিতার অঙ্গার-চিহ্ন, মড়ার মাথা আর পোড়া হাড়ের টুকরোয় তার গর্ভ ভরাট হয়ে ওঠে। তারপরেই আবার নতুন চিতা জ্বলে, লকলকে আগুনের শিখা প্রতিফলিত হয় অস্বাস্থ্যকর কালচে জলের ওপর, শ্মশান ক্রমশ এগিয়ে আসে লোকালয়ের কোল পর্যন্ত। আগে যেখানে মড়া নিয়ে যেতে হলে পর পর তিনখানা পোড়ো জমির মাঠ পেরিয়ে যেতে হত, এখন সেখান থেকে হরিধ্বনি দিলে গ্রামের ঘরে ঘরে তার সাড়া জেগে ওঠে।

তর্করত্ন পেছনে ফিরে তাকালেন। নিঃশব্দ ঘুমন্ত গ্রাম। ঘুমন্ত! আতঙ্কে মূর্ছিত—মৃত্যুতে অসাড়। যে বাড়িতে সাতটি লোক ছিল তার চারটিই হয়তো মরে শেষ হয়ে গেছে, একজনের হয়তো ভেদবমি ধরেছে আর বাকী দুজন খুব সম্ভব শহরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতকে কালো মেঘ অমাবস্যার মুখোস পরিয়েছে—এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো নদীর কালো জলকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে।

—দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ—

কাতর আর্তকণ্ঠে তর্করত্ন আহ্বান করছেন। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর, একপাশে রাখা টাইম-পীসটার কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে আড়াইটের ঘরে। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ডে উচ্ছলিত রক্তের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘড়ির কাঁটার তাল পড়ছে—টিক্ টিক্ টিক্। রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন, তা হলে—তা হলে—তর্করত্ন আর ভাবতে পারছেন না। অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে। পুরোহিত, কুমোর—কারো রক্ষা নেই। টাকার লোভে বিদেশে এসে শেষে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেল!

গাঁজার ঝোঁকে কাশী কুমোর ঝিমুচ্ছে। কেশব ঢুলী ঢাকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে ওরা ঘুমুচ্ছে—আশ্চর্য। গ্রামের দিক থেকে মাঝে মাঝে এক একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—নিজের রক্তের মধ্যেও যেন তর্করত্ন শুনতে পাচ্ছেন সেই কান্নার প্রতিধ্বনি। বাতাসে পচা মড়ার গন্ধ ভাসছে—মুখে আগুন ছুঁইয়েই গ্রামের লোক মড়া ফেলে গেছে এখানে ওখানে। নদীর দুর্গন্ধ আবদ্ধ জলে সাদা মতন ওটা কী ভাসছে? একটা মানুষ যে অমন অতিকায়ভাবে ফুলে উঠতে পারে এ যেন কল্পনাই করা যায় না! ঝোপে-ঝাড়ে শেয়ালের ডাক উঠছে, আর তার জবাব দিচ্ছে মড়াখেকো শ্মশানকুকুরের একটানা কান্নার মতো অস্বাভাবিক আর্তনাদ।

চারিদিকে এত শেয়াল, অথচ দরকারের সময় একটার দেখা নেই!

শিবাভোগ। শেয়াল এসে ভোগ গ্রহণ না করলে পুজো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তর্করত্ন বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারায় মানুষ নন; তিনি শাস্ত্র

বিশ্বাস করেন, দেবীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। সারাজীবন এই করেই তাঁর কেটেছে। পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নানা জায়গা থেকে ক্রিয়াকর্মে তাঁর ডাক আসে ; বাঙালা দেশের বহু বড়লোকের বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় পান তিনি। তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ তাঁকে ডেকে এনেছে দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর নিজের হাত কামড়ে খেতে ইচ্ছে করছে, সমস্ত চেতনা চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছে। এমন বিপদে তিনি জীবনে আর পড়েন নি।

বলাই ঘোষও সামনে নেই। তাঁকে পূজোয় বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে গিয়ে বোধ হয় ঘুম লাগিয়েছে। হয়তো ভেবেছে, আর ভাবনা নেই। তর্করত্নের মতো সিদ্ধ পুরুষ, পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে যিনি দৈনন্দিন কালী পূজো করেন, তিনি অনায়াসেই গ্রাম থেকে সমস্ত মড়ক আর আধিব্যাধির বালাই দূর করে দিতে পারবেন। কিন্তু তর্করত্ন যে কী সর্বনাশের সামনে দাড়িয়ে বলির পশুর মতো কাঁপছেন, একথা বলাই ঘোষের ভাববারও ক্ষমতা নেই। একবার বলাই ঘোষকে সামনে পেলে—তর্করত্ন হিংস্রভাবে ভাবতে লাগলেন—বলাই ঘোষকে সামনে পেলে তিনি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিতেন : সবংশে দেবীর উদরে যাও তুমি, তুমি উচ্ছন্নে যাও।

ঝিমুতে ঝিমুতে কাশী কুমোর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

—কী ঠাকুর, কী খবর ?

—খবর আবার কী ? যা কপালে আছে, তাই হবে।—কথার শেষদিকটা কান্নায় কাঁপতে লাগল।

—শেয়াল এল না ?

—নাঃ। তর্করত্নের চোখে এবার অশ্রু ছল ছল করে উঠল।

—ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদে তেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিম্‌সে লুচি আর পোয়াটাক্ বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।

—তুই থাম হারামজাদা—বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন তর্করত্ন: যা বুঝিসনে, তার ওপর কেন কথা কইতে যাস।

—হে-হে-হে—নির্বোধ শব্দ করে কাশী কুমোর হেসে উঠল। গাঁজার নেশায় তার ভয় ডর ভেঙে গেছে।—আচ্ছা, আমি থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়। আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার আর কী হবে ঠাকুর।

তা বটে, তার কিছুই হবে না। কিন্তু তর্করত্নের তো তা নয়। তাঁর ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেপিলে আছে। তিনি মরলে তাদের খেতে দেবে এমন কেউ নেই। তিনশো টাকা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে কদিন! আর এই দুর্ভিক্ষের বাজার। মৃত্যু যেন চারিদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে—একেবারে সমস্ত গ্রাস না করে তার খিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার বাকি আছে কোথায়।

সামনে কালী মূর্তি। কাঁচা কালো রঙ জলজল করছে, ঘামের মতো টপটপ করে তার দু এক বিন্দু ঝরে পড়ছে দেবীর পায়ের তলায় —মহাদেবের সমস্ত মুখে এঁকে দিয়েছে বিষাক্ত ক্ষতের চিহ্ন। সমস্ত মূর্তিটা যেন জীবন্ত—চোখ দুটো রক্তে মাখা। এ মূর্তিও সাধারণ নয়, তৈরী করতে হয় শ্মশানে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয় শ্মশান চিতার

কয়লা, তারপর রাতারাতি বিসর্জন দিতে হয়। তাড়াতাড়িতে তৈরী করতে গিয়ে কাশী কুমোর দেবীর মূর্তিকে ঠিক দেবী করে গড়ে তুলতে পারেনি, সবটা মিলিয়ে একটা পৈশাচিক বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তার একটা দীর্ঘ ছায়া পেছনে নদীর জলে গিয়ে পড়েছে, স্রোতের টানে সেই ছায়াটা কাঁপছে—পচা মড়ার দুর্গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসছে তর্করত্নের।

কাশী কুমোর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢোলের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে কেশব ঢাকী। কী আশ্চর্য রকমে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ওরা। সমস্ত শ্মশান, সমস্ত দিক-প্রান্তর যেন কার মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শেয়াল ডাকছে না—গ্রামের দিক থেকে আবার কান্নাটা গেছে থেমে। শুধু মাথার ওপর শুক্লা চতুর্দশীর আকাশ মেঘের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আতঙ্কে যেন থমথম করছে।

হাওয়ায় অল্প শীতের আমেজ। পরনের খাটো রক্তবস্ত্রে শরীরের সবটা ঢাকা পড়ছে না। ভয়ের সঙ্গে শীতের শিহরণ মিশে গিয়ে তর্করত্ন কাঁপতে লাগলেন, কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল: দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ—

দূরে কলাপাতার ওপর শিবাভোগ শীতের স্পর্শে ঠাণ্ডা আর বিবর্ণ হয়ে আসছে। আর একপাত্র তীব্র কারণ গলায় ঢেলে নিলেন তর্করত্ন। মুহূর্তে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। দেবী আসবে না? নিশ্চয় আসবে, আসতেই হবে তাকে। সারাজীবন ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবীর আরাধনা করছেন তিনি। সাধারণ পূজারী যেখানে এগিয়ে যেতে সাহস করে না, সেই তান্ত্রিক পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে তিনি নিত্যপূজা করেন। তাঁর আহ্বান দেবীকে শুনতে হবে—শুনতেই হবে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তিনটে। তা হোক।

তর্করত্ন নিজের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ধ্যান করছিলেন খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময়ে চমকে জেগে উঠলেন তিনি। দপ-দপ-দপ। আকস্মিকভাবে খানিকটা উগ্র দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠেই পেট্রোম্যাক্সটা নিবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে এসে ভেঙে পড়ল বিরাট একটা বন্যাস্রোতের মতো। গুঁড়োয় গুঁড়োয় জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে, বৃষ্টি নামল নাকি?

উঠে আলোটা জ্বালবার একটা প্রেরণা বোধ করেই সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্ন নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বৃথা হয়নি, মিথ্যে হয়নি তাঁর সকাতর প্রার্থনা। দেবী এসেছেন। কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দু হাতে সে শিবাভোগ গো-গ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবোনোর একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এল।

কিন্তু দু হাতে? দু হাতে কি রকম? তর্করত্ন আবার তীব্র চমক অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শেয়ালের তো হাত থাকে না। তা হলে—তা হলে—দেবী কি নিজের মূর্তি ধরেই তাঁর ভোগ গ্রহণ করতে এসেছেন?

নিজের মূর্তি ধরেই? ভয়ে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথা থেকে ঠেলে উঠল একটা দুঃসহ আনন্দের জোয়ার। সারাজীবন ধরে যে সাধনা তিনি করেছেন, আজ তা সম্পূর্ণ সার্থক হল। এই মহাশ্মশানে আর মৃত্যুর বিরাট উৎসবের মধ্যে দেবী এবার মূর্তি ধরেই নেমে এসেছেন। বিস্ফারিত চোখ মেলে তর্করত্ন দেখতে লাগলেন কী ক্ষুধার্তভাবে চোখদুটো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের

মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

শিউরে উঠে তর্করত্ন চোখ বুজবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কে যেন সে দুটোকে জোর করে টেনে ধরে রেখেছে। কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক, ঘুমুক, দেবীকে স্বচক্ষে দেখবে এত পুণ্য ওরা করেনি। চারদিকে রন্ধ্রহীন কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ, আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

—দেবী, প্রসন্না হও, প্রসন্না হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, মারীভীতদের রক্ষা করো। প্রসন্না হও, প্রসন্না হও—

ভীত শুক্‌নো গলায় উচ্চারিত হতে লাগল ক্ষীণ প্রার্থনা। কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তর্করত্ন নিজেই তা শুনতে পেলেন না।

ঘড়ির কাঁটায় তাল পড়েছে—টিক্-টিক্-টিক্। তর্করত্নের বুকের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি। কালো অন্ধকারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সময় যেন এগিয়ে যেতে পারছে না, বার বার করে থমকে দাঁড়াচ্ছে। হাড় চিবোনোর শব্দটা তারই মধ্যে ক্রমাগত কানে আসছে। তর্করত্নের গলা শুকিয়ে আসছে, সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আর একবার একপাত্র কারণ খেয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু নড়বার সাধ্য নেই, কে যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে অসাড় আর অনড় করে দিয়েছে।

—হি-হি-হি—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ হাসিতে সমস্ত শ্মশানটা থর থর

করে কেঁপে উঠল। তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দিকে দিগন্তে। মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুল গাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ডটো যেন লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেই আবার ধড়াস করে আছড়ে পড়ে গেল।

কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী চমকে জেগে আর্তনাদ করে উঠল। অমানুষিক ভয়ে বুজে-আসা চোখ দুটো খুলে তর্করত্ন দেখতে পেলেন, সে মূর্তিটা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে একটা দ্রুত বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি।

—জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা—তর্করত্ন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলেন।—ওরে বাজা, বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা—বাজা। জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা মহাকালী।

আবার পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে উঠল। শিবাভোগ নিঃশেষিত। এমন হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল সচরাচর দেখা যায় না।

কেশব ঢুলী প্রাণপণে ঢাকে ঘা লাগাল। কারণের বাকীটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলেন তর্করত্ন। কাশী কুমোর গাঁজার কলকেটা নতুন করে সাজতে বসল।

রাত ভোর হয়ে আসছে। সাড়ে চারটে। মাথার ওপর থেকে কালো মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, তার একপাশ দিয়ে অস্তগামী চাঁদের উজ্জ্বল আলো এতক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। যেন মৃত্যুর যবনিকা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্মশানকালী প্রসন্ন হাসিতে হেসে উঠেছেন।

ভোরের আগেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা গ্রামের ঘরে ঘরে

আলোড়ন জাগিয়ে দিলে। শ্মশানকালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন, কলিযুগে দেবীর এমন প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের কথা আর শোনা যায় না। এখন আর ভয় নেই, এবার গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশ রক্ষা পাবে। মারী থাকবে না, মন্বন্তর থাকবে না। মৃত্যুমগ্ন গ্রামের ওপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠল। তর্করত্নের চোখ দিয়েও দরদর করে জল পড়তে লাগল। তাঁর সাধনা এতদিনে সফল হয়েছে—দেবী এসে সশরীরে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

বেলাবেলিই ষ্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তর্করত্নের। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে যেতে দিলে না। বলাই ঘোষ তো গলায় কাপড় জড়িয়ে সারাদিনই তাঁর পদতলে পড়ে রইল। ধূলো দিতে দিতে পায়ের এক পর্দা চামড়াই উঠে গেল তর্করত্নের। আর সমবেত জনতার কাছে সত্যিমিথ্যের রঙ ছড়িয়ে ব্যাপারটা ফলাও করতে লাগল কাশী কুমোর।

—মাকে দেখবার পুণ্যি তো করিনি, তাই পাপচোখে কী মোহ-নিদ্রাটাই নেমে এল। সবই তাঁর লীলে। আর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মা নিজেই নেমে এসে শিবাভোগ খেলেন। গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খাঁড়া, জিভ থেকে টক টক করে পড়ছে রক্ত। তারপর সে কি ভয়ানক হাসি! শুনলে যেন পেটের পিলে ফুসফুস এক সঙ্গে চড়াৎ করে ফেটে যায়। চমকে তাকিয়ে দেখি—

সমবেত জনতার উদ্‌গ্রীব ভয়ার্ত মুখের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুরু করলে: চম্‌কে তাকিয়ে দেখি—

সন্ধ্যার পরে তর্করত্ন গরুর গাড়িতে চেপে ষ্টেশনে যাত্রা করলেন। শেষরাতে ট্রেন ধরতে হবে। তারপর শহর।

গাড়ির অর্ধেকটা দানে আর দক্ষিণায় বোঝাই। কলা, মূলো, নারিকেল, কাপড়—আরো কত কী। এদিক দিয়ে বলাই ঘোষের কার্পণ্য নেই, ধানের ব্যবসা করে সে মেলা টাকা কামিয়েছে এবারে। তা ছাড়া ঘোষপাড়া গ্রামটাই তালুকদার আর মহাজনের দেশ। যুদ্ধের বাজারে তারা মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণার অঙ্কে তিনশো টাকার জায়গায় তারা পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। তর্করত্ন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন। পাঁচশো টাকা একটা কালী পূজোর দক্ষিণা! যুদ্ধের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি না হলে এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারত।

অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তর্করত্ন একটা বিড়ি ধরালেন।. গাড়ি চলেছে মন্থরগতিতে। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলো করে দিয়ে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। কালকের মেঘাচ্ছন্ন শ্মশানের সঙ্গে এর কত তফাৎ। শহরের অনেকগুলো লক্ষ্মী-পূজো আজ তর্করত্নের নষ্ট হয়ে গেল—তা যাক, বলাই ঘোষ অনেক বেশী পরিমাণে তার ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে।

দুপাশে দূর বিস্তৃত মাঠ। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দিকে দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—চমৎকার ফলন হয়েছে এবার। মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ তালের গাছ প্রহরীর মতো কালো ছায়া ফেলছে। পথের দুপাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া বিস্তার করে দিয়েছে। এখানে ওখানে গ্রাম; এত শস্য—এত জীবনের মধ্যেও মৃত্যু তার মন্বন্তরের স্পর্শে নিস্তব্ধ।

—হঃ—হঃ—হঃ—

জিহ্বা-তালু সংযোগে একটা প্রবল শব্দ করে গাড়োয়ান গাড়িটাকে থামিয়ে দিলে।

—কী হল রে ?

তর্করত্ন চমকে উঠলেন। এই নির্জন মাঠের মধ্যে—ডাকাত নয় তো ? সঙ্গে পাঁচশো নগদ টাকা, বিস্তর জিনিষপত্র। বড় ভরসাও নেই।

—রাস্তার ওপর ডোমপাড়ার পাগলিটা পড়ে আছে বাবু।

—কে ডোম পাড়ার পাগলি ? কী হয়েছে ?

—ওই—গাড়োয়ানের স্বরে বেদনার আভাস লাগল : আকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরেছে বোধ হয়।

তর্করত্ন সভয়ে গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন।

—থাক, থাক যেতে দে। পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চলে যা। যে রোগ, বিশ্বাস নেই বাবা।

গাড়ি চলতে লাগল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাশি রাশি জ্যোৎস্না —সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের মৃদু-গম্ভীর শব্দ, ওরাও কি লক্ষ্মীপূজো করে নাকি ? কোজাগরী। লক্ষ্মী ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে যান—কে জাগে ? চাঁদের দুধে ধানের শীষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠছে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্য লক্ষ্মীকে আহ্বান করছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে ক্ষেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠ-মল্লিকার সুরভিতে কি তাঁরই শ্রী অঙ্গের পদ্মগন্ধ ?

তর্করত্নের মনটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা। পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী, তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।

এত ধান, এত ফসল, পুষ্করা কেটে যাবে বই কি। কিন্তু একটা জিনিষ তর্করত্ন বুঝতে পারেন নি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই—আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে—কালীর মতো জীব মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারে নি।

কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।

ভাঙা চশমা

মফঃস্বল শহরে ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাষ্টারী। তার সঙ্গে কুড়ি টাকা করে দুটো ট্যুশনি। মোট তা হলে দাঁড়ালো একশো টাকা। একজন ফার্ষ্ট ক্লাস এম এর জীবনে চূড়ান্ত আর্থিক পরিণতি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার চতুর্বর্গ।

কণ্ট্রোল আর কালোবাজার। ইন্‌ফ্লেশন। রেশন কার্ডের অবরুদ্ধ অঞ্জলি দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় যা চুঁইয়ে পড়ে তাতে চিঁড়ে ভেজে না। অণুর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার। বাইরের ঝড় ঝাপটা যদি বা সহ্য হয়, প্রেয়সীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে বাণপ্রস্থ নিতে ইচ্ছে করে। কয়েকবারই ভেবেছি কা তব কান্তা বলে, একদিন যাত্রা করব হরিদ্বারের পথে। কিন্তু দার্জিলিং মেলের হ্যাণ্ডেলে পঞ্চভূতের দোদুল্যমান অবস্থা দেখে বৈরাগ্য ছাড়িয়ে নির্বেদ আসে। সন্ন্যাস নেওয়াটা শক্ত নয়, কিন্তু ট্রেনে কাটা পড়ে অপঘাত মৃত্যুটা কেমন যেন লোভনীয় বলে মনে হয় না।

স্কুল মাষ্টার আমরা—ভাবী যুগের দেশনেতা, সমাজনেতা—অথবা হয়তো বুদ্ধ চৈতন্যের মতো মহামানবেরাই আমাদের মন্ত্রবাণীতে লালিত হয়ে উঠছে। বুনো রামনাথের মতো তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়েই অবশ্য আমাদের মতো জ্ঞানতপস্বী আচার্যের খুশি হয়ে থাকা উচিত—কিন্তু দেখলাম কিছুতেই মানসিক প্রশান্তির ঐ স্তরটাতে নামা যাচ্ছে না—বিশেষ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো লর্ড ওয়াভেল

এসে একদা আমার অনুপপত্তির সন্ধান নেবার জন্য পনের টাকা ভাড়ার এই টিনের চালায় পদার্পণ করবেন—এতখানি আশাবাদী হওয়া শক্ত। সুতরাং দিক্‌বিদিক্ লক্ষ্য না করেই মস্ত একটা ঝাঁপ দিলাম। যুদ্ধের বাজার মানেই তো স্পেকুলেশন। অতএব—

অতএব টিঁকে যাই তো ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, নতুবা পুনর্মূষিক। 'ত্বয়া হৃষীকেশ'—শাস্ত্রের শাঁসবাক্য তথা সার বাক্য উচ্চারণ করে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করলাম।

ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট করা দরকার। শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের মৃত্যুতে প্রথম ঘণ্টার পরেই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা তাদের উদগ্র শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্যে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ পেয়ারা গাছে উঠল, কেউ কেউ ক্রিকেট নামিয়ে স্কুলের মাঠে পিটোতে সুরু করলে। আবার দল বেঁধে জনকয়েক যাত্রা করলে শহরের বাইরে ডাঁসা কুলেরর সন্ধানে। আর আমরা টীচার্স রুমে বসে চীনে বাদাম আর সিগারেট সহযোগে অবিলম্বে বর্তমান যুদ্ধটা শেষ করে দেবার জন্যে একটা অত্যন্ত জরুরী খসড়া তৈরী করতে লেগে গেলাম।

এমন সময়ে অকুস্থলে হেড মাষ্টারের প্রবেশ। পরম বৈষ্ণব-লোক—গলায় কণ্ঠি। সেক্রেটারীর বাড়ীতে খোল বাজিয়ে নাম-কীর্তন করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ছেলেদের বেত মারবার আগে সনিশ্বাসে বলেন, কৃষ্ণের জীবের ওপর কৃষ্ণের কাজ করতে হবে—কৃষ্ণের ইচ্ছা। দপ্তরী বলে, ওঁর বেতের সঙ্গে নাকি সুতো দিয়ে তুলসী পাতা বাঁধা আছে।

হেড্ মাষ্টার ঘরে ঢুকলেন হাতে একখানা ছাপান চিঠি নিয়ে।

বললেন, একটা খবর আছে আপনাদের জন্যে। দেখুন, কৃষ্ণের ইচ্ছেয় কারো কারো হয়তো সুবিধে হয়ে যেতে পারে।

জার্মানীকে আপাতত বিপন্ন রেখে আমরা এক সঙ্গেই চিঠিখানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রোমাঞ্চিত হওয়ার মতো খবরই বটে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জানাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে রিলিফ ওয়ার্ক করবার জন্যে সাব-ডেপুটি গ্রেডের কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। আমাদেরই নাকি প্রেফারেন্স দেওয়া হবে সর্বাগ্রে। যদিও অস্থায়ী চাকরী, তবুও যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন তা' হলে হেড্ মাষ্টারের মনোনয়ন অনুসারে—

স্কুল মাষ্টারের বরাতেও শিকে ছেঁড়ে তা' হলে। অতএব উকিল বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে প্যান্টালুন আর বেমানান কোট্ পরে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম। এবং বললে আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না—চাকরী হয়ে গেল। বারোয়ারী কালী পাঁচশিকের ভোগ পেলেন আর অণু অচির ভবিষ্যতে হাকিম-গৃহিণী হওয়ার মধুময় স্বপ্ন দেখতে লাগল। একে বনিয়াদী পরিবারের মেয়ে, তার ওপরে গ্রাজুয়েট স্কুলমাষ্টারের স্ত্রী হয়ে ওর শিক্ষাদীক্ষা প্রত্যেকদিন ওকে ধিক্কার দিচ্ছিল। মনে মনে ভাবলাম হোক্না আবুহোসেনের নবাবী, তবু অত্যন্ত কয়েকটা দিন অণুর মুখে হাসি ফুটে উঠুক।

হেড্ মাষ্টার বললেন, কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্। যান, কৃষ্ণের ইচ্ছেয় হয়তো উন্নতি হয়ে যেতে পারে। আর আপনাদের মতো ব্রাইট্ য়ংম্যান—

আমি সনিশ্বাসে বললাম, আজ্ঞে হাঁ, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

কিন্তু হাকিম হতে চাইলেই যে হাকিম হওয়া যায় না, কয়েক দিনের মধ্যেই সেটা মর্মে মর্মে টের পাওয়া গেল। মাসের মধ্যে

কুড়ি দিনই টুরে বেড়াতে হয়। সাইকেলের চাকার নীচে পেরিয়ে যাই মাইলের পরে মাইল, দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রাম আমার প্যাণ্টের ক্রীজ আর হ্যাটের ঔদ্ধত্য দেখে চমকে ওঠে। অবিশ্রান্ত সেলাম পাই, দলে দলে লোক সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ডাক-বাংলোর সামনে এসে ভিড় করে। প্রভুত্বের আস্বাদ নতুন-রক্ত খাওয়া বাঘের মতো চেতনার মত্ততা জাগিয়ে তোলে। মনে হয় এই এই তো জীবন—এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার সত্যিকারের সম্মানটা এতদিনে আমি আদায় করে নিয়েছি। 'আপনি মনিব, আপনি মা-বাপ, আপনি জেলার কর্তা।' টেষ্টের নম্বর জানবার জন্যে ছেলেরা এসে যখন দ্বারস্থ হত, তখন অবচেতন গৌরবে বুকটা ভরে উঠত সত্যি। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনা!

ওষুধ-কম্বল-রেশনের ব্যবস্থা। সরকারী দাক্ষিণ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মুক্তধারার মতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে যায় অবিশ্রান্ত কাজের চাপে, তবুও মাঝে মাঝে মনটা ক্লান্ত আর সংশয়গ্রস্ত হয়ে ওঠে। শ্মশানের ওপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করে কী লাভ।

শ্মশান। তা বই আর কী। মন্বন্তর নির্বিবাদে বয়ে গেছে—এসেছে ম্যালেরিয়া। শীতের সন্ধ্যায় ঝোপ জঙ্গল থেকে খানিকটা বিষাক্ত আর শ্বাসরোধী অন্ধকার এসে যেন আচ্ছন্ন করে দেয় পৃথিবীকে। এনোফিলিসের গুঞ্জনে সন্ধ্যাবেলাতেই মশারির মধ্যে আশ্রয় নিই। বাইরের ধানকাটা মাঠ তারার আলোয় বিষণ্ণ পাণ্ডুর হয়ে পড়ে থাকে—পচা ডোবার জলে আলেয়া। দূরে দূরে শেয়ালের ডা[illegible] শুনি—শকুনের আর্তনাদ অবরুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। [illegible]য়ে মানুষের গলা শুনতে পাই না—শিশুর কান্না ভেসে আসে [illegible] [illegible]। ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষে হতশেষ মানুষ ইঁদুরের মতো চি[illegible]

করে। আর না খেয়ে মায়ের বুকে ছটফট্ করে শুকিয়ে মরে গেছে শিশুরা—ভাবী স্বাধীন ভারতের মানবকের দল।

নানা দুর্বল মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় স্কুল মাষ্টারের নিরীহ সত্যসন্ধ মন। যেন একটা বিরাট প্রহসনের বিদূষক বলে বলে মনে হয় নিজেকে। যাদের মৃত্যুর জন্যে শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েই আমরা পাপক্ষালন করতে পারব না, তাদের কবরের ওপর রিলিফের সান্ত্বনা ছড়ানো যেন তাদের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কী প্রয়োজন ছিল এর' যারা মরতে বসেছে শান্তিতেই মরতে দাও তাদের। যাদের নগ্ন করোটি নিয়ে আজ শেয়ালেরা নদীর চড়ায় টানাটানি করছে—তাদের কংকাল মুখে আজ নিশ্চয়ই আমাদের দাক্ষিণ্য দেখে আনন্দের হাসি উৎসারিত হয়ে উঠছে না। কোটরসর্বস্ব চোখে যদি আগুন থাকত, তা হলে এতদিনে সে আগুনের জ্বালায় আমরা নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যেতাম।

কিন্তু কী হবে এ-সব অবাস্তর ভাবনায়। চাকরী করতেই এসেছি। আবু হোসেনের রাজতক্ত—পরমায়ু তিন মাস না ছ মাস কে জানে। তবুও হাকিমী তো বটে।

আর্দালী হৃদয় প্রামাণিক খাবার নিয়ে আসে। মশারির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে বসেই আহার পর্বটা শেষ করে নিই। তারপরেই ডাকবাংলোর ফিতের খাটে লেপের তলায় আলস্যমন্থর তন্দ্রা জড়িয়ে আসে। ভয়ানক শীত পড়েছে এবার। স্বপ্নের ভেতর মণুর মুখখানা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, মনে পড়ে বাইরে শীতার্ত ষর মৃত্যুর মধ্যে থর থর করে কাঁপছে।

......দুঃখে সুখে দিন যায়। মাইনে ছাড়াও কিছু কিছু মেলে। দ-মাষ্টারী বিবেক আগে মাঝে মাঝে চাবুক মারতে চাইত, কিন্তু

এখন সমস্ত সহজ হয়ে গেছে। আগাগোড়া যন্ত্রটাই এক সুরে বাঁধা। বিবেকের তাগিদে যে মূর্খ বেসুর গাইতে যায়, তিন দিনেই কানে মোচড় খেয়ে তারস্বরে ঐকতান তুলতে হয় তাকে। মনে ভাবি, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

সেদিন সকালে চা খেয়ে ডাক-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলাম। শীতের রোদ মধুর উষ্ণতায় সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপরে পা তুলে দিলাম। ভারী ভালো লাগছে। দু মাস আগে ঠিক এমনি সময় ছাত্রকে নিয়ে মল্ল যুদ্ধে লেগে যেতাম—মূর্তিমান নির্বুদ্ধিতা দেখে মনে হত নিরেট মাথাটার ওপরে সবেগে নেস্‌ফিল্ডখানা আছড়ে ফেলে বেরিয়ে চলে যাই। কিন্তু মাসান্তে কুড়িটি করে টাকা। পড়বার জন্যে নয়, প্রাইভেট টিউটর রাখবার জন্যেই।

তার সঙ্গে কী আকাশ-পাতাল তফাৎ। জিতেছি নিশ্চয়ই—জীবনের চক্রনেমি উল্টো গতিতে ঘুরতে সুরু করেছে। ভালো করে 'কোরাস্‌' গাইতে পারলে পাকাপাকি হয়তো হয়েও যেতে পারি, এমনি একটা আশা উপরিওলা সেদিন দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের জয় হোক্‌—রিলিফের জন্যেই তো এমন চাকরীটা আমি পেয়ে গেলাম। মড়ক বিশেষ না হলে জীববিশেষের পার্বণ হয় না, আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে।

ডাক-বাংলোর নীচে ভিড় জমেছে। হৃদয় প্রামাণিক নাম-ধাম লিখছে খাতায় আর রামদুলাল কম্বল বিতরণ করছে দুঃস্থদের। অমানুষিক মানুষের একটা বীভৎস সমাবেশ। ছেঁড়া কাপড়ের ভেতরে হাড় বের করা অতীতের মানুষগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। কাঁধ পর্যন্ত জটা বাঁধা চুল, মুখে এলোমেলো দাড়ি, চোখের দৃষ্টিতে ঘষা কাঁচের মত অর্থহীন শূন্যতা।

হঠাৎ হৃদয়ের ওপর লক্ষ্য পড়তেই আমার নিশ্চিত আরামটা যেন চমক খেল একটা।

উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এতদিনে কেন যে দালালে নিয়ে যান নি, সেইটেই আশ্চর্য। অনাহারে শীর্ণ হলেও যৌবনশ্রী এখনও প্রকট, আর শতজীর্ণ গাত্রবাসের ভেতর দিয়ে সেই যৌবন অসহায় করুণতায় নিজেকে বাইরের আলোতে মেলে ধরেছে। দেখলাম, হৃদয়ের চোখে আগুন। খাতায় সে নাম লিখছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা মরা-গোরুলোভী শকুনের মতো তীক্ষ্ণ আর নির্লজ্জ।

রাগে আর বিরক্তিতে শরীর জ্বালা করে উঠল। ডাকলাম, হৃদয়।

হৃদয় উঠে এল তটস্থ হয়ে।

—আজ্ঞে?

—কে ওই মেয়েটা?

হৃদয় যেন হকচকিয়ে গেল একটু। সন্দিগ্ধ এবং সংকুচিতভাবে একবার তাকাল আমার দিকে। তারপরে ঠোঁট চেটে বললে, আজ্ঞে, ওই কমলপুরের—

—ওকে কম্বল দিয়ে এক্ষুনি বিদায় করে দাও, বুঝেছ?

—আজ্ঞে।—ঘাড় নেড়ে সবিনয়ে জবাব দিলে হৃদয়, তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়। বেশ বুঝতে পারছি নিজের মনে মনে কদর্য ভাষায় নিশ্চয় গালগালি দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু স্কুল মাষ্টারী মনটাকে এখনো জয় করে উঠতে পারেনি—এসব ইতরতা দেখে আপনা থেকেই সেটা বিষিয়ে ওঠে।

সকালের সোনালি রোদটা মনের সামনে বিস্বাদ হয়ে গেল। হৃদয়ের চোখে যে আগুন দেখলাম একি আমাদের সকলের পক্ষেই সত্যি নয়? মানুষের চরম দুর্গতির সুযোগ কি আমরা সবাই নিচ্ছি

না? ষাট টাকা মাইনের স্কুলমাষ্টার থেকে হাকিমীর এই রাজতক্ত— মাঝখানের পথটা কিসে তৈরী? চকিতের জন্য মনে হল এর চাইতে নগণ্য মাষ্টারীটাই বোধ হয় ছিল ভালো, অত্যন্ত—

—নমস্কার স্যার।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক—অথবা ভূতপূর্ব ভদ্রলোক বললেই বোধ হয় নির্ভুল হয় সংজ্ঞাটা। গায়ে অত্যন্ত ময়লা কাঁধ ছেঁড়া লংক্লথের পাঞ্জাবী—যেন চামড়ার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে সেটা। ধূলি ধূসর কাপড়টা লাল ক্যাম্বিশের জুতোর আগা দিয়ে তিন চারটে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। বুক পর্যন্ত শাদা কালো দাড়ি, চোখে কাঁচ ভাঙা চশমা।

নিজের অজ্ঞাতেই মনটা সংকুচিত হয়ে উঠল। সেই দুঃখের চিরন্তন ফিরিস্তি শুনতে হবে। পুত্র-কন্যা-গৃহিণীর দুর্গতি, ধানের দর, দেশের অবস্থা। উপসংহারে কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে সাহায্য পাওয়ার সকাতর আবেদন।

বললাম, কী বলবেন, বলুন।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার অনুমানের ধার দিয়েই গেলেন না। সগর্বে বললেন, আমি এখানকার মাইনার স্কুলের হেডমাষ্টার। আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বললাম, বসুন—বসুন।

ভদ্রলোক প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন: না, না বসব না। আমরা কি আর হাকিমের সামনে চেয়ারে বসতে পারি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, প্রিপোজিশন না পড়লে কি ইংরেজী শেখা যায় কখনো?

এবার আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালাম। হ্যাঁ—যা ভেবেছি তাই। ভদ্রলোক ঠিক আত্মস্থ নেই। ঘোলা চোখ দুটো লাল টকটক করছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে সে যেন আমার দিকে তাকাচ্ছে না—তাকাচ্ছে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে পেছনের দেওয়ালটার দিকে। কালো বিবর্ণ ঠোঁটের দু পাশে শুকিয়ে রয়েছে লালার দাগ, তার ওপর কোথা থেকে উড়ে এসে বসেছে নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড মাছি। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, সে তো নিশ্চয়। প্রিপোজিশনই তো ইংরেজির আসল জিনিষ।

—এই দেখুন, দেখুন। এত করেও একথা আমি ওদের বোঝাতে পারলাম না। এইজন্যেই তো আজকালকার এম-এ পাশ করা ছেলেরা অবধি এক লাইন ইংরেজী লিখতে গিয়ে পাঁচটা ভুল করে বসে থাকে। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলাম লোকগুলো তাঁর দিকে কেমন একটা অদ্ভুত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার মানসিক জিজ্ঞাসাটা অনুভব করে মৃদু হাসল হৃদয়। বললে, ও কিছু না হুজুর, পাগল।

—পাগল?

—হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছে। আগে হেডমাষ্টার ছিল, এখন—

হৃদয়ের কথাটা শেষ হতে পেল না। একদল লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কাজের আবর্তে তলিয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। মৃত্যুর এত প্রাচুর্যের মধ্যেও যে দুর্ভাগারা মরতে পারেনি তারা বাঁচবার জন্যে এখনো একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করতে চায়।

সন্ধ্যার ডাকে অণুর চিঠি পেলাম।

পুরু নীল রঙের খাম—অভ্যস্ত রীতিতে কোণাকুণিভাবে ঠিকানা

লেখা। ওর হাতবাক্সের মিষ্টি গন্ধ চিঠিটার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে। আজ পনের দিন ধরে অবিশ্রান্ত 'টুরে' ঘুরছি ওর সঙ্গে দেখা নেই। নির্জন আর নিরানন্দ গ্রামের মধ্যে আড়ষ্ট সন্ধ্যায় মনটা হু হু করে উঠল। বিয়ের পরে দুজনে কখনও এক সঙ্গে এতদিন আলাদা হয়ে থাকিনি। মাষ্টারী জীবনে দুঃখ ছিল অনেক, অতৃপ্তি ছিল অগণিত; কিন্তু শীতের এই ক্লান্ত সন্ধ্যায় অন্তত অণুর কাছ থেকে আমাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। সমস্ত দিনের অতি বাস্তবতার পরে সন্ধ্যার রোম্যান্স আসত ঘনিয়ে। মোমবাতির আলো জ্বেলে দুজনে বৈষ্ণব পদাবলী পড়তাম: সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দা—

সত্যি তো চাঁদ উঠেছে। শীতের মরা জোৎস্না—কুয়াশায় আড়ষ্ট আর বিষণ্ণ। দূরের মাঠ পাণ্ডুর আলোতে মায়াময় হয়ে আছে। গ্রামগুলো যেন খণ্ড খণ্ড কালো অন্ধকারের সমষ্টি। মাঠের পাশ দিয়েই একটা ক্ষীণস্রোতা নদী জোৎস্না আর হিমের মলিদা জড়িয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। শীতের জোৎস্না যেন ডাকছে। ওই মাঠের ভেতর দিয়ে একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? গায়ে একটা ওভারকোট চড়িয়ে নেমে পড়লাম।

পায়ে চলা ছোট পথ। ঘন ঘাস জমেছে দুপাশে। কন্টিকারী আর সেয়াকুল কাঁটা মাথা তুলেছে এখানে ওখানে। শিশিরে ভিজে রয়েছে সমস্ত, আমার জুতোটাকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাঙলাদেশের চোখের জলের মতো শিশিরবিন্দু চাঁদের আলোয় টলমল করছে। শীতের দিনে সাপের ভয় নেই, আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে চললাম।

কুয়াশার আড়ালে চাঁদ হাসছে। অণুর অশ্রুসজল মুখখানির মতো। বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা ধূ ধূ করছে। নাঃ আর পারা যায় না। যেমন করে হোক অন্তত দুদিনের জন্যেও একটিবার ওর কাছ থেকে ঘুরে আসা দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে ছোট নদীটার কাছে চলে এলাম। খাড়া পাড়ি পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা জমি, নীচে নদীর ঘোলা জল তির তির করে বয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একটা বেড়ার মতো টানা রেখায় কতগুলো ডাল পালা মাথা তুলে রয়েছে, বোধ হয় মাছ ধরবার কোনো বন্দোবস্ত রয়েছে ওখানে। তার গায়ে জমে রয়েছে একরাশ কচুরি—বাতাসে তারি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

মাটির খেয়ালে মাথা তুলেছে এলোমেলো কতগুলো টিবি—ইতস্তত বিকীর্ণ একরাশ ছিন্নমুণ্ডের মতো। তারি একটার ওপরে রুমাল পেতে বসে পড়লাম। ওপারে বালুচর—ফুল ঝরে যাওয়া মুমূর্ষু কাশের বন। সামনে চাঁদ জ্বলছে। শূন্য দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। অণু পাশে থাকলে—

—নমস্কার স্যার।

চমকে উঠলাম। যেন মাঠ ফুঁড়ে মাইনার স্কুলের সেই হেডমাষ্টার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অস্পষ্ট জোৎস্নায় ভালো করে চেনা যায় না—শুধু ভাঙা চশমার কাচটা জ্বল জ্বল করছে।

—হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি? কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা স্যার, অসুখ করবে। তার চাইতে চলুন না, আমার স্কুলটা দেখে আসবেন। অনেক কষ্টে একা হাতে এটাকে গড়ে তুলেছি, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ছাত্র যোগাড় করেছি। আসুন একবার দেখে যান।

আমি সভয়ে বললাম, রাত্রে কিসের স্কুল মশাই?

—আজকাল সব সময়েই স্কুল হয় স্যার। দিন রাত সব সময়। দয়া করে একবার পায়ের ধূলো দিতেই হবে। আপনাদের মতো লোককে পাওয়ার সৌভাগ্য তো আর সব সময়ে হয় না।

হেডমাষ্টার আমার মুখের সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। চশমার পেছনে দুটি অপ্রকৃতিস্থ চোখের দৃষ্টি আমি যেন শিরাস্নায়ু দিয়ে অনুভব করতে পারলাম। একটা দুর্গন্ধ নিশ্বাস এসে আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল—বন্যজন্তুর নিশ্বাসের মতো।

ইচ্ছা হল ছুটে পালিয়ে যাই—চীৎকার করে লোক ডাকি। কিন্তু ভাঙা চশমা দুটা আমার দিকে মেলা রয়েছে জ্বলন্ত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে—যেন আমাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ করে ফেলছে।

বরফের মতো ঠাণ্ডা আর অতিকায় মাকড়শার পায়ের মতো কালো কালো কতগুলো বাঁকা আঙুলে হেডমাষ্টার আমার একখানা হাত চেপে ধরলে। সমস্ত শরীরটা আমার ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু আমি কথা বলতে পারলাম না—কেবল জ্বলন্ত চশমার আড়ালে দুটো দুর্বোধ্য চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটা সত্যি সত্যিই মানুষ তো? না দূরের বাঁকের ওই শ্মশানঘাটা থেকে উঠে এল কোনো একটা অশরীরী আত্মা, মৃত বাংলার প্রেতমূর্তি?

—আসুন স্যার দয়া করে, আসতেই হবে আপনাকে।

অতিকায় মাকড়শার হিমশীতল পাগুলো হাতের উপর চেপে বসেছে—চামড়ায় খোঁচা লাগছে নখের, যেন বরফের দাঁত বসে যাচ্ছে। ছাড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হল কিন্তু পারলাম না। পৌষের শীতের সঙ্গে ভয়ের শিহরণ মিশে গিয়ে আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

আমি কম্পিত গলায় বললাম, কাল সকালে—

—না স্যার, কোন ওজর আপত্তি শুনব না আপনার। এক্ষুনি আসতে হবে। হাতে ধরে মিনতি করছি স্যার। বুড়ো মানুষ, আধপেটা খেয়ে ইস্কুলটাকে গড়ে তুলেছি। আপনি একবার দেখবেন না?

কেন জানি না, আমি চলতে সুরু করে দিলাম। শিশিরে ভেজা মাঠ পেরিয়ে অন্ধকার আমের বন। পায়ের নীচে ঝরা পাতা আর ধুলোর গন্ধ। বাগানটা ছাড়িয়ে আসতেই সামনে দেখা দিলে খোড়ো একটা আটচালা বাড়ি। অর্ধেকটা ধ্বসে পড়েছে—বাকিটার খড় ঝরে যাওয়া চালের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর আলো চিত্র-বিচিত্র একটা বিরাট বোড়া সাপের মতো ঘরের মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়েছে। হেডমাষ্টার আমার হাত ধরে টেনে তারই ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পচা খড় আর গোবরের ভাপসা-গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে টানতে লাগলাম।

—এই আমার স্কুল স্যার। সারাজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলাম। বৌয়ের হার বিক্রী করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব, হেডমাষ্টার হবো। কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন

আমি কথা বলতে পারলাম না। শুধু বিস্ফারিত চোখে জলন্ত ভাঙা চশমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।—না, না, স্যার—এ হতেই পারে না। হঠাৎ চীৎকার করে উঠল হেডমাষ্টার, ভাঙা বাড়িটা আতঙ্কে যেন শিউরে উঠল: আছে, সবাই আছে। তারা কোথাও

যায়নি, যেতে পারে না। আপনি শুনুন স্যার, কেমন পড়াতে পারি আমি।

ভাঙা বেড়ার গায়ে কবাটশূন্য একটা জানলার দিকে তাকিয়ে হেডমাষ্টার সুরু করলেন : বয়েজ, আজ তোমাদের প্রিপোজিশন পড়াব। তোমরা জানো, ভালো করে যদি ইংরেজী শিখতে হয়—

আমি প্রাণপণে সংযত করে নিলাম নিজেকে। পালাতে হবে, পালাতে হবে এখান থেকে। একবার হেডমাষ্টারের দিকে তাকালাম। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছেন, আমার উপস্থিতির কথা ভুলে গেছেন তিনি। নিঃশব্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি বেরিয়ে এলাম, তার পরে দ্রুত পায়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। শুধু দূর থেকে হেডমাষ্টারের দরদ ভরা গলা কানে আসতে লাগল : প্রথমেই ধরা যাক 'ইন' আর অন। এ দুটোর ব্যবহার—

পায়ের নীচে ঝরা আমের পাতাগুলো মর মর করতে লাগল। যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই—আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।

আমার দামী কোটের ক্রীজগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় ঝকঝক করতে লাগল। হাকিমী জুতোর উদ্ধত পদক্ষেপে আর্তনাদ করতে লাগল ধুলোয় ভরা গ্রামের পথ। হেডমাষ্টারের মন্ত্র উচ্চারণের মতো টানা কণ্ঠস্বর দূরে অস্পষ্ট হয়ে এল আর নদীর ওপারে কাশবনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল শেয়াল।

—

বন-বিড়াল

মধ্যস্থ হয়ে মুস্কিলে পড়ে গেছি। কোন দিকে রায় দিই। একদিকে জাগ্রৎ নারীত্বের জ্বালাময়ী রূপ, আর একদিকে বর্তমান সমাজের সবচাইতে বড় সমস্যা—সাম্যবাদ, সারপ্লাস ওয়েল্‌থ, সামাজিক অত্যাচার ইত্যাদি বিবিধ জটিল পরিস্থিতি আমার চিন্তায় তালগোল পাকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছু একটা অবিলম্বেই করে ফেলা উচিত, নইলে মান থাকে না। অতএব গম্ভীর মুখে পর পর দুটো সিগারেট নিঃশেষ করে বললুম, তাই বলে স্বামীকে ছেড়ে যাবি? হিন্দুর মেয়ে না তুই?

মেয়েটা কাঁইমাই করে উঠল। বোঝা গেল আর্যধর্মের সারগর্ভ আর্ষ বাক্যগুলো ওকে কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। মাথাটাকে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বিদ্রোহিণীর মতো সতেজ তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিলে, সে তুমি যাই বলো মামাবাবু, ওকে নিয়ে আমি কিছুতেই ঘর করতে পারব না।

পতি দেবতাটি ধৈর্য ধরে বসেছিল এতক্ষণ। খড়ি-ওড়া রুক্ষ শরীর, তামাটে রঙের চুলগুলোতে তেলের সংস্পর্শ ঘটেনি অনেক কাল। শ্বাপদের মতো কটা চোখগুলো একবার ধক ধক করে জ্বলে উঠল। কিন্তু লোকটা দাগী চোর, আর কিছু না হোক মনের ভাবটা গোপন করবার ক্ষমতা বহুকাল আগেই আয়ত্ত করে বসে আছে। বেশ শান্ত নিরীহ গলায় বললে, তুই চলনা এবার ঘরে

ফিরে। সত্যি বলছি আর আমি চুরি করব না। তোর জন্যই তো এ সব করি, আর শেষে তুই-ই—

মেয়েটা বললে, থাম আর বকিসনি। কার জন্যে চুরি করিস সে কি আমি জানিনে। সুখীর বাড়ীতে সারারাত ফুরতি চলে, ভালো ভালো কাপড় গয়না সবই তার পায়ে ঢেলে বসে থাকা হয়। যেদিন কিছু জোটে না, সেদিন যত ফাঁকা ভালবাসা নিয়ে—মরি, মরি, কি আমার রসের সোয়ামি রে— !

কটা চোখের আগুন আরো তীব্র, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। যথাসময়ে সে যে স্ত্রীর মাথার এক গাছি চুলও উপড়ে ফেলতে বাকী রাখবে না এটা মনশ্চক্ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু গলার স্বরে যেন সোহাগের মধু শতধারায় উছলে পড়ল তার: কী যে পাগলামী করিস্ দুলী, কিছু ঠিক নেই তার। তুই চলনা এইবার ঘরে ফিরে। শেষে যদি—

—কী, কী হবে ঘরে গেলে? সোনার পাটে বসিয়ে পূজো করবি, না? বেড়ার চাঁছা বাখারীগুলো তা হলে কী কাজে লাগবে? দোহাই মামাবাবু, তুমি যদি এর একটা ব্যবস্থা করে না দাও তো আত্মঘাতী হতে হবে আমাকে।

অনেকক্ষণ ধরে দুলীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলুম আমি। কালো হলেও কুরূপা নয়, স্বাস্থ্য আর লাবণ্যের দীপ্তি সমস্ত শরীরে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে; নাকের ডগাটা কাঁপছে রোষস্ফুরিত উত্তেজনায় আর সেখানে চিক চিক করছে ছোট্ট একটা রূপার ফুল। এমন মেয়ে আত্মঘাতী হলে সংসার যে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ কথা আমার মনে না পড়ে গেল না।

বললুম, সত্যিই তো। বছরের মধ্যে তুই ছ'মাস জেল খাটবি,

বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে আবার চুরি করবি, তোকে নিয়ে কোন মেয়ে ঘর বেঁধে থাকতে পারে তুই-ই বল তো মাখনা।

মাখনা এইবারে কেঁদে ফেলল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না যে পুরুষমানুষ কখনো ওভাবে কাঁদতে পারে। পিঁচুটি চিহ্নিত দুটো চোখের কোল বেয়ে তার টপ টপ করে জল পড়তে লাগল, আর মুখভঙ্গি যা হয়ে উঠল তা দেখে কুইনিন-চিবানো শিম্পাঞ্জীরও লজ্জা হবে। কাঁদবার সময় মানুষমাত্রকেই অবশ্য অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়, কিন্তু সে বিশ্রী যে কতখানি হওয়া সম্ভব, তা মাখনাকে দেখেই অনুধাবন করা গেল। হেঁচ্‌কি ওঠার মতো শব্দ করে মাখনা কাঁদতে লাগল। তার চোখের এবং নাকের সম্মিলিত ধারার নিঃশ্রাব দেখে গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল আমার।

সে কান্নায় পাষাণও বোধ করি গলে তরল হয়ে যেতে পারত, কিন্তু দুলী পাষাণের চাইতেও কঠিন। কালো মুখে মারাত্মক একটা ভঙ্গি করে বললে, আর ডাক ছেড়ে মড়া-কান্না কাঁদতে হবে না তোর। সুখী তো আছেই, অমন হাউ হাউ করছিস কিসের দুঃখে!

প্রহসনের যবনিকাপাত না করলে গম্ভীর্য রক্ষা করতে পারবনা, মান রাখাও কঠিন হবে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললুম, আচ্ছা যা, এখন যা। আমি ভেবে দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

হেঁচ্‌কি তুলতে তুলতে এবং নাক ঝাড়তে ঝাড়তে মাখনা বললে, দোহাই বাবু, আপনি যদি—

আমি ততক্ষণে এক লাফে ঘরের দরজার কাছে এসে পড়েছি! একটু হলেই খানিকটা নাসিকা-রস আমার চটিটাকে অভিসিক্ত করে দিত। ত্রস্ত স্বরে বললুম, যা, যা, সে হবে এখন।

সত্যি ভাবনার কথা। উচ্চবর্ণা আর্যকন্যা হলে নানারকম অস্ত্র ছিল হাতে। দামী দামী নৈতিক উপদেশ, গীতায় থাক বা না থাক গীতার নামে খানিকটা দুর্বোধ্য অনুস্বার বিসর্গ কিংবা আদর্শ পত্নীত্বের উপাখ্যান সম্বলিত দু চার খানা ভালো ভালো উপন্যাস কাজে লাগাতে পারতুম—চন্দ্রশেখর তো হাতের কাছেই ছিলই। কিন্তু দুলী আর্য-নারী নয়, ভুঁইমালীর মেয়ে। জীবনের গতিটা সরল এবং প্রত্যক্ষ-গোচর, পরকাল কিংবা রৌরব-নরকের বহ্নিময় বিভীষিকা দেখিয়ে তাকে নিরস্ত বা নিরস্ত্র করা যাবে না। দৈনন্দিন জগতে আমাদের আত্মঘাতী নেশাগুলোকে এখনো ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পারে নি ওরা—তরল অবলেপের তলা থেকে ওদের অনার্য প্রাণশক্তি অনায়াসে নিজেকে অভিব্যক্ত করে; তাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমুন্নত সরল গাছের মতো শ্যামল সুস্থতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শাস্ত্রের ঘুণ দিয়ে ওদের ভূপাতিত করা অসম্ভব।

অবশ্য স্বামী হিসাবে মাখনাও এমন কিছু শিবসাক্ষাৎ পুরুষ নয়। নামকরা চোর। পাকাপাকি বন্দোবস্ত জেলখানাতেই, তবে মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাবার জন্য দর্শন দেয় বাইরের পৃথিবীতে। আর সেই কটা দিনেই সে বিশ্বসংসারকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে। দড়ির ওপর থেকে কাপড় নেই, ঘাটে ভিজান বাসন নেই, এমন কি দিনে দুপুরে বাইরের ঘরে টেবিল থেকে থ্রী-ক্যাসলের প্রায় আস্ত টিনটাই নেই। শেষ ট্র্যাজেডীটা ঘটেছিল আমারই কপালে। অমন দামী ভার্জিনিয়া তামাক, নিশ্চয় গাঁজার কল্‌কেতেই টেনে মেরে দিয়েছে হতভাগা।

এই সব কারণে মাখনার ওপর আমি যে সুপ্রসন্ন হয়েছিলুম এমন মিথ্যে বলতে পারব না। কিন্তু নালিশ যখন এসেছে তখন

একটা বিহিত করা তো নিশ্চয় দরকার। তা ছাড়া চিরন্তন নিয়ম অনুসারে স্বামী যতই দুর্বৃত্ত হোক্ না কেন, পুণ্যবতী স্ত্রী তার ঘর করবে, পদসেবা করবে এবং পদাহত হবে—এই হচ্ছে মনু, পরাশর, রঘুনন্দন কোম্পানীর অনুশাসন।

এম-এ পরীক্ষার পরে ছুটির তিন মাস দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। উত্তর বাংলার অজ পল্লীগ্রামের চক্ররেখা অবধি প্রসারিত ধানের ক্ষেত, চিহ্নহীন বিল আর প্রচুর বুনো হাঁস—লাল শর, কাল শর, দীঘলি, কোদালঠোঁটি, সরালী, চখাচখী, কাদাখোঁচা, রাজহাঁস। বাইরের বারন্দায় ইজি চেয়ারে বসে অজস্র সিগারেট পুড়িয়ে এবং অবসর সময়ে বিলে আর নদীতে পাখীর বংশ নির্বংশ করে কাটাব এই ছিল সংকল্প। কিন্তু এই অতি কঠিন দাম্পত্য সমস্যা আপাতত আমাকে চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। আরো বিশেষত মাখনীর কথাগুলো ঠিক এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত নয়, রীতিমত কঠিন সোস্যালিজমের প্রশ্ন।

—খেতে না পেলে কী করব বাবু, চুরি করব না?

ঠিক এই প্রশ্নই বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করে-ছিল। মনে এল, চুরি করাই উচিত, কিন্তু থ্রী-ক্যাসেলের শোকটা তখনো ভুলতে পারিনি। তা ছাড়া দুলীর দিকটাও বিবেচনা করতে হবে, এক তরফা ডিগ্রী দিলে চলবে না। বাস্তবিক যে কোন মেয়ের পক্ষেই চোরের ঘর করা কঠিন—তা সে ভুঁইমালীই হোক্ আর নমঃশূদ্রই হোক। কাজেই নারীত্ব বনাম ধনসাম্যবাদের এই সঙ্ঘর্ষে মধ্যস্থ আমি—ত্রিশঙ্কুর মতো কেবল অশ্রান্তভাবে চা আর সিগারেট ধ্বংস করে চললুম।

দিদি একদিন চটে উঠল: সব সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে

ভাবিস কী রঞ্জন? ওদের ভাবনায় ভাবনায় তুই-ই যে সারা হয়ে গেলি দেখছি।

বললুম: তুমি কিছু বুঝতে পারছ না দিদি। দাম্পত্য জীবনের কত বড় জটিল একটা—

দিদি বোমার মতো ফেটে পড়ল: হয়েছে, হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের জটিলতা কত সমাধান করে ফেলেছিস তুই। ও মুখপোড়াদের যেমন সমাজ, তেমনি স্বভাব। বিয়ে নেই, নিকে নেই, যার সঙ্গে খুশী ভিড়ে যায়। ওদের ভাবনা ভেবে মিথ্যে মাথা খারাপ করছিস কেন?

সত্যি মাথা খারাপ আমাকে আর করতে হল না। শাস্ত্র আর ন্যায়ের সর্পিল পথে ওদের ভাবনা এগিয়ে চলে না, কাজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান ঘটাল ডুলী নিজেই।

সকালবেলায় ভালো করে ঘুমটা ভাঙেনি তখনো। বাইরের জানলা দিয়ে খানিকটা সোনালি রোদ এসে বিছানার উপর পড়েছে, জানালার ওপারে সেই রোদের রঙ লেগে ঝিলমিল করছে নিমগাছের কচি কোমল পাতা। আচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে অর্ধচেতনভাবে ভাবছি পিগ্‌ম্যালিয়নের কথা। ডুলীকে যদি বার্ণার্ড শ'র ফ্লাওয়ার গার্লের মতো আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে কলকাতার সভ্য সমাজের আওতায় নিয়ে ফেলা যায়, তা হলে আর কিছু না হোক তিন মাসের মধ্যেই ওযে বাংলা দেশে নতুন করে একটা সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলন অন্তত সুরু করে দেবে—এইরকম একটা কল্পনায় স্নায়ুগুলো বেশ উত্তপ্ত আর উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। শুধু সাফ্রেজিষ্ট নয়—যে কোনো বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব। অনায়াসে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে লুক্সেমবার্গের মতো বলে বসতে পারত: সোস্যালিজম! ইট্‌স্ ইন মাই ব্লাড!

কিন্তু উঠোনে শোনা গেল মাখনার তারস্বরে আর্তনাদ, আর সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রার লঘু আচ্ছন্নতা, প্রগাঢ় এই সব তত্ত্বজিজ্ঞাসা—হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। কেউ ওকে ধরে ঘা কয়েক লাগিয়েছে নাকি? একটা চাদর জড়িয়ে বাইরে আসতেই মাখনা হাঁউমাউ করে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ল।

দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললুম, কিরে, হয়েছে কী?

সেই অপরূপ কান্না আর অমানুষিক খানিকটা ধ্বনিবিন্যাস। অনেক কষ্টে তার মর্মোদ্ধার করা গেল, তুলী চলে গেছে বাবু।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় গেছে?

—গাঁয়ের বাইরে। বীরুয়ার সঙ্গে।

—বীরুয়া? কোন্ বীরুয়া? ওই যে বাঁদর নাচায়?

—হাঁ বাবু।

কী আর বলা যায়। অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবু মাখনার অসহায় করুণ মূর্তিটা দেখে সহানুভূতি এল আমার। বললুম, চলে গেছে—তা হলে আর কী করবি। থানায় গিয়ে একটা ডাইরী করিয়ে আয় বরং, তোর বউকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

—থানায়?—মাখনা অপ্রসন্ন আর নিরুত্তর হয়ে রইল। থানায় যাবার পরামর্শটা অবশ্য তার তেমন পছন্দ হওয়ার কথা নয়। পুলিশের সঙ্গে সম্পর্কটা লোকত শ্বশুরকুল ঘটিত হলেও ওখানকার জামাই আদরের পদ্ধতিটা মাখনা সমর্থন করে না। তা ছাড়া আশে পাশে ঘটি বাটি চুরিরও কামাই নেই আজকাল এবং দারোগা ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো একেবারে মুখিয়ে আছে।

যাওয়ার আগে মাখনা আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল: ওকে

খুন করে আমি ফাঁসি যাব বাবু।—এক ইঞ্চি প্রমাণ ময়লার কোটিং দেওয়া লাল দাঁতগুলো মুখের ভিতর থেকে যেন তাড়া করে এল আমার দিকে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলুম, তাই যা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরুয়া!

ভুলীর রুচিকে প্রশংসা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল আমার পক্ষেও। বীরুয়াকে ভাল করেই চিনি। দূর গ্রাম থেকে এসেছে, জাতে মুণ্ডা। ছিপছিপে পাতলা চেহারা, গায়ের রঙ যেন বার্ণিশ করা কালো। এক মাথা বাবরী চুল; চুলের সম্পর্কে ভারী সজাগ দৃষ্টি আছে তার, পথ চলতে চলতে ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্ট চিরুণি বের করে সযত্নে আঁচড়ে নেয় মাথাটা। গলায় লাল কাঁচের মালা, দু হাতে দুটো চাঁদির বালা ঝোড়ো মেঘে বিদ্যুতের মতো কালোর পটভূমিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটা ছোট্ট কঞ্চি দুলিয়ে তারই তালে তালে বানর নাচায়, গুন গুন করে গান গায়:

"আগন মাসে ধান কাটে ফাগুন মাসে বিয়া,
বুধু, নাচ করো—"

ফাল্গুন মাসে বিবাহের শুভ-সম্ভাবনায় আনন্দে বুধুর নৃত্যকলা উদ্দাম হয়ে ওঠে। পায়ের ঘুঙুর বাজতে থাকে, পরণের লাল নীল ঘাগরাটা কখনো ঘোমটার ভঙ্গিতে মাথায় তুলে দেয়, কখনো সেটাকে হাতে ধরে যাত্রার সখীর মতো নাচে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পটাপট গায়ের এখান ওখান থেকে উকুন ধরে উদরসাৎ করে। তারপর চৌকীদার হয়, বুড়ো সেজে তামাক খায়, বীরুয়ার হাতের

কঞ্চিটা এক লাফে ডিঙ্গিয়ে হনুমানের মতো লঙ্কা পার হয়। অবশেষে নতজানু হয়ে বাবুদের কাছে ভিক্ষা চায়, খাবার চায়।

আমাদের বাড়ীতেই তো বীরুয়া কতবার আসে বানর নাচাতে। একে ভিন্ দেশী লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। বাংলায় একটা শব্দ উচ্চারণ করতে তিনবার হোঁচট খায়। তা ছাড়া বানর নাচিয়ে যা রোজগার করে তাতে ওর নিজের পেটই চলে কিনা এ বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কী সুখের আশায় দুলী গিয়ে ওর সঙ্গে ঘর বাঁধল।

মনে মনে বললুম, ভালোবাসার ধর্মই তো এই। চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপিত হয় তার অতি কঠিন ব্রত। মাধনার কাছে থাকলে অন্নবস্ত্রের ভাবনা ছিল না কিন্তু সেখানে ওর নারীত্ব পদে পদে খর্ব হত, লাঞ্ছিত হত। তাই সমাজ-সংসার-জাতি-ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে সর্বত্যাগের মধ্যে ওর নারীত্ব মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছে।

আর্যকন্যা এবং আর্যবধূ দিদিকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেও পারা গেল না। একটু ফলাও করে জিনিষটা বিশদ করবার চেষ্টা করতেই সে আমাকে একগাছা লাঠি নিয়ে তাড়া করলে, মন্তব্য করলে: অমন নারীত্বের গলায় দড়ি।

দুলীর কিন্তু লজ্জা নেই, সঙ্কোচও নেই; জীবনে যাকে সে বরণ করে নিয়েছে, অত্যন্ত অনায়াসেই দু দিনের মধ্যেই সে তার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠল। কালোপাড় শাড়ীটাকে বিসর্জন দিয়ে পরলে বেদের মেয়েদের মতো রঙচঙে বাহারে কাপড়, গায়ে পাতলা ওড়না। বেণীটাকে ইরাণী মেয়েদের মতো ঝুলিয়ে দিলে পিঠের ওপর। গলায় পরলে কাঁচের মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি। এমন কি বাংলা বলার কায়দাটাকে অবধি রপ্ত করে নিলে বীরুয়ার মতো।

অত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, স্বামী ছেড়ে বাসা বাঁধল একটা সমাজহীন, গোত্রহীন যাযাবরের সঙ্গে কিন্তু কোনখানে এতটুকু চিহ্নও পাওয়া গেলনা তার। শেষে একদিন আমাদের বাড়ীতে বানর নাচাতে এল। একাই।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসে আমি তখন একটা পৃথুলকায় পূজা সংখ্যা পড়ছিলুম। টুমটুমির শব্দে চমকে বই সরিয়ে দেখলুম ডুলীকে। নতুন বেশে বাসে তম্বঙ্গী মেয়েটাকে চমৎকার মানিয়েছে। স্বচ্ছ ওড়নার অন্তরালে রাঙা কাঁচুলির আভাস, ঘাগরার মতো করে পরা ছাপা শাড়ীটা নেমে এসেছে পায়ের পাতা পর্যন্ত। আমাকে দেখে কালো মুখের ভেতর থেকে এক ঝলক শুভ্র শুশ্রী হাসি ঝরিয়ে বললে, বানর নাচ দেখবি মামাবাবু?

গা জ্বলে গেল। বললুম লজ্জা করেনা তোর?

ডুলী এবার এক গাল হাসল। বললে, লজ্জা ভদ্দরলোকের, লজ্জা করলে কি আমাদের পেট চলে?

বললুম, হলই বা চোর। কিন্তু তোর সোয়ামী তো বটে। তাকে ফেলে একটা ভবঘুরের সঙ্গে—

কথাটা শেষ করবার আগেই ডুলী প্রবল শব্দে টুমটুমি বাজাল—টুম্ টুম্ টুমটাম্। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে চারিদিক থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে বানর নাচ দেখবার জন্য। আমার কথাটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বললে, বুধু, নাচ করো।

বললুম, মাথনা কী বলেছে জানিস?

ডুলী এবার দুষ্টুমী ভরা তরল চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে হাসিমুখে গান ধরলে, "আগন মাসে ধান কাটে, ফাগুন মাসে বিয়া—"

আমি বললুম, ফাগুন মাসে তো বুধুর বিয়ে হবে, কিন্তু মাখনা বলেছে তার আগেই তোকে খুন করে সে ফাঁসি যাবে।

দুলী অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করলে, তার চোখে সেই দুষ্টুমীভরা কৌতুক ঝলমল করছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলুম সব খেই হারিয়ে গেল! আবার মনে পড়ল বার্ণাড শ'র সেই পিগম্যালিয়ন। কালো হলেও কৃষ্ণকলি, আর চোখের দৃষ্টিটা হরিণীর নয়, ব্যাধের। সভ্যসমাজের আওতায় গিয়ে পড়লে ও যে দুদিনেই সেখানে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র রইল না।

টুমটুমির তালে তালে গান চলতে লাগল। ঢংটা বীরুয়ার, কিন্তু এমন মধুক্ষরা কণ্ঠ বীরুয়া কোথায় পাবে। মনে হল দুলীকে পাঠিয়ে বীরুয়া বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। আগের চাইতে এখন তিন গুণ রোজগার হবে নিশ্চয়।

বুধু নেচে চলেছে পরমানন্দে। শুধু আগন মাসে ধান আর ফাগুন মাসে বিয়েই নয়, ঘর-সংসার পেতে বসলে আরো ঢের ভালো ভালো জিনিষের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে :

"হাটের চুচুরা মাছ, বাড়ীর বাইগণ,
তাই খায়্যে বুড়াবুড়ীর নাচন কোন্দন,
বুধু নাচ করো—"

হাটের চুচুরা মাছ আর বাড়ীর 'বাইগণে' নিশ্চয় চমৎকার তরকারী রান্না হবে। কিন্তু তার চাইতেও বানর যে নাচাচ্ছিল, তাকেই বোধ করি বুধুর পছন্দ হয়েছিল বেশি। অন্তত আমার তাই মনে হল। নাচের ভঙ্গিটা অত্যন্ত প্রসন্ন আর স্বাভাবিক, বীরুয়ার হাতের যে উদ্যত

কঞ্চি তাকে নৃত্যকলায় প্রবুদ্ধ করে, তার সঙ্গে এই 'কঙ্কণ ঝঙ্কৃত' নাচের কোথায় যেন একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

নাচ এবং নানারকমের খেলা দেখিয়ে বুধু নতমস্তকে আমার সামনে হাত পাতল। নীলচে চঞ্চল চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে মিটমিট করছে।

দুলী বললে, বুধুকে বক্‌শিস দাও বাবু।

পকেট থেকে একটা সিকি দুলীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, নে, পালা।

চটুল চোখের দৃষ্টিটা আরো তরল, আরো মদির করে দুলী বিচিত্র ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর দড়িসুদ্ধ বুধুকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, চলি মামাবাবু, সেলাম।

পরধর্ম গ্রহণ করবার ক্ষমতাটা মেয়েদের বিস্ময়কর। আগে বলত, প্রণাম।

পনেরোদিন, একমাস, দুইমাস। সব সহজ হয়ে এল। যেদিন খুশি আসে, বানর নাচায়, দাবী করে বেশি বক্‌শিস্ নিয়ে যায়। কোনদিন বীরুয়া সঙ্গে আসে, কোনদিন একা।

মাখনাও অবশ্য বিব্রত করে যায় মাঝে মাঝে, দুলীর আশা ছাড়তে পারেনি এখনো। কিন্তু দিন কয়েক আগে সিঁদ কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং কোমরে দড়ি পরে সদরে চালান হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনে দিয়েই সদরের রাস্তা। যাওয়ার আগে হতভাগা হাতকড়াবাঁধা অবস্থায়ই আমাকে একটা প্রণাম জানিয়েছে, একগাল হেসে বলছে, দিন কয়েক বেড়িয়ে আসতে চললাম, মামাবাবু, আপনি একটু দুলীকে বুঝিয়ে বলবেন।

তুলীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা অবশ্য করিনি। তবে নিশ্চিন্ত হয়েছি একদিক থেকে। থ্রী-ক্যাসলের টিনটা নির্ভয়ে বাইরের বারান্দার টেবিলেই রাখতে পারি আজকাল। তা ছাড়া সকালে উঠেই মাখনার সেই বিলাপ ও বিক্ষোভ শুনতে হবে, এটা প্রায় রাত্রের দুঃস্বপ্ন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রণামের বিনিময়ে মনে মনেই আশীর্বাদ জানালুম, দোহাই ঈশ্বরের, জেল থেকে তুমি আর এ যাত্রা ফিরে এসো না বাপু।

কিছুদিন পরে তুলী একাই আসে বানর নাচাতে, বীরুয়াকে আর সঙ্গে দেখিনা। ঠাট্টা করে একদিন বললুম, কিরে, বীরুয়া সঙ্গে এলে বুঝি রোজগার ভাল হয় না?

ইঙ্গিতটা কিন্তু তুলী লক্ষ্য করলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভারী গলায় জবাব দিলে, মরদটার বিমার হয়েছে বাবু।

—অসুখ হয়েছে? কী অসুখ?

তেমনি ভারী গলায় তুলী বললে, তা জানিনা বাবু। রোজ বোখার হয় আর ভারী দুব্‌লা হয়ে গেছে। রহিম কবিরাজের দাওয়াই তো খিলাচ্ছি, তবু—

বললুম, যেমন মাখনাকে অকূলে ভাসিয়ে চলে এসেছিস্, তেমনি মাখনার শাপে—

তুলী চোখ দুটো বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল। দেখলুম, সে চোখে তির্যক তীক্ষ্ণ কটাক্ষচ্ছটা নেই, স্নায়ুকে উদ্বেল করে তোলবার কোন আমন্ত্রণ নেই। শুধু দু ফোঁটা জল তার দুই প্রান্তে টলমল করছে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। তারপর বুধুকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, চল।

কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি আর অনুতাপে বিস্বাদ হয়ে গেল মন। ভাবলুম, ওকে ডাকি, একটা টাকা বক্‌শিস দিয়ে খুসী করে দিই। কিন্তু দুলী তখন হন হন করে অনেকটা এগিয়ে গেছে, তার রঙীন শাড়ীর আঁচলটা বাতাসে উড়ছে পলাতক প্রজাপতির প্রসারিত পাখনার মতো।

তারই দিনকয়েক বাদে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দিদি এসে দর্শন দিলে।

—রঞ্জন, এর তো একটা বিহিত করতে হয় ভাই।

চমকে বললুম, কিসের বিহিত করতে হবে ?

—বন-বিড়ালের। কবুতরগুলোকে সব শেষ করে দিলে। বিয়াল্লিশটা ছিল, আজ ধান খাওয়ার সময় গুণে দেখি মোটে চব্বিশটা।

ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্ষোভেরই বটে। কবুতরের প্রতি দিদির অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব—এমন কি নিজের ছেলে মেয়েদের চাইতেও। বাইরের বারান্দায় অসংখ্য ঝুড়ি, ভাঙ্গা কলসী আর কেরোসিন কাঠের বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দিদির পোষা কবুতরেরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই সব ঝুড়ি কলসীর রাজ্যপাট ভোগ দখল করে আসছে। দিদির মেজ ছেলে পার্থসারথি ওরফে খোকা সেই রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক। রোজ সকালে মই বেয়ে উঠে সে প্রজাবর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। আর সচীৎকারে ঘোষণা জানায়ঃ মা, আরো তিনটে ডিম হয়েছে ছিট্‌কপালীর বাক্সে। চাঁদা গলীর (গলায় চাঁদ যে কবুতরীর) বাচ্চা দুটো বোধ হয় দুতিন দিনের মধ্যেই উড়তে পারবে—

সকালে খবরের কাগজ পড়বার মতো কবুতরদের খবরাখবর নেওয়া দিদির প্রত্যাহিক নেশায় দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর আর সবাই যে এই বিষয়ে সহানুভূতি পোষণ করে এমন মনে করবার কারণ নেই। বিশেষ করে বাইরের দেওয়াল এবং বারান্দাটার যে অবস্থা তারা করে রেখেছে তা আদর্শ গৃহস্থালীর অনুকূল নয়। কিন্তু কেউ যে এতটুকু প্রতিবাদ জানাবে তার সাধ্য কি? দিদির ধারণা ওরা লক্ষ্মীর বাহন এবং যতদিন ওরা থাকবে ততদিন লক্ষ্মীও অচলা এবং অনড়া হয়ে থাকবেন। সেইজন্যই রোজ সকালে আধ সের ধান খাইয়ে এবং যথাসাধ্য পরিচর্যা করে ওদের খুশী রাখবার চেষ্টা চলছে।

জামাইবাবু যেমন শক্তিমান, তেমনি মাংসাশী পুরুষ। পায়রা পোষবার ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি নেই, তবে সামান্য একটু সংশোধন প্রস্তাব তাঁর ছিল। সেটা গুরুতর কিছু নয়, মাঝে মাঝে দুচারটেকে ধরে ব্রাহ্মণ সেবায় লাগালে ধানের অন্তত কিছুটা প্রতিদান পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে তো দেখা যাচ্ছে ওরা মহাভারতোক্ত সগর রাজাকেও পাল্লা দিচ্ছে, অতএব—

অতএব অতিশয় প্রচণ্ড এবং আমাদের পক্ষে অতিশয় উপভোগ্য একটা দাম্পত্য কলহের মধ্যে ব্যাপারটার পরিণতি হয়েছে। মাংসলোভী স্বামীর অভব্য বুভুক্ষা দেখে দিদি চটে-মটে সেই দিনই একটা মহাকায় খাসী আনিয়ে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে এবং নীরবে একাই সের তিনেক মাংস নিঃশেষ করে জামাই বাবু দিদিকে আশীর্বাদ করেছেন, হে সাধ্বি, আশীর্বাদ জানাচ্ছি তুমি রাজ-মহিষী হও।

রাগের ওপরেও দিদি হেসে ফেলেছে, আশীর্বাদ আমাকে, না নিজেকেই?

—একই কথা। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে'।

দিদির নাম সতী।

সেই কবুতর—ইতিহাসখ্যাত সেই কবুতরগুলো দিনের পর দিন কমে আসছে। এক আধটা নয়: বেয়াল্লিশটা থেকে চব্বিশটায় দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ বন-বিড়াল হানা দিচ্ছে রাত্রিতে। এতগুলো সবই যে বন-বিড়ালে খেয়েছে তা নয়, বেশির ভাগই ভয় পেয়ে পালিয়েছে। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা না করলে দিদির ঝুড়ি কলসীর রাজ্য তিন দিনেই জনশূন্য, মতান্তরে আপদশূন্য হয়ে যাবে।

দিদি প্রায় কাঁদবার উপক্রম। বললে, একটা ব্যবস্থা কর রঞ্জন। গত বছরেও এমনি উপদ্রব সুরু করেছিল। তারপর থানায় হাঁস খেতে গেলে দারোগাসাহেব সেটাকে গুলি করে মারে। সেই থেকে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলুম। হতভাগা আবার কোথা থেকে এসে জুটেছে. এটাকে না মারলে তো আর—

নারীর অশ্রু দেখে বীরত্ব জেগে উঠল। বললুম, আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।

যে কথা, সেই কাজ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাইরের বারান্দায় এসে গুটিশুঁটি হয়ে বসলুম। সিগারেটের টিন, গায়ে মোটা ওভারকোট। হেমন্তের শিশিরস্নাত আকাশ থেকে বেশ শীতের আমেজ নেমেছে। তা ছাড়া ওপারেই দিগন্ত প্রসারিত শূন্য মাঠ—সেখান থেকে হু হু করে বাতাস আসছিল।

গ্রীনারের বন্দুকটা হাতের কাছেই তৈরী আছে। অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করছে ব্যারেলের দামী ইস্পাত। দুটো নলেই টোটা পুরে রেখেছি—বুলেট নয়, বী বী। বুলেট মিস করতে পারে, কিন্তু

বী-বীর দু চারটে ছর্‌রা অন্তত লাগবেই এবং একটা বন-বিড়ালকে ঠাণ্ডা করতেই ছর্‌রাই যথেষ্ট।

বন্দুকের কুঁদোটা মাঠের খোলা হাওয়ায় যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ওভারকোটে পা ঢেকে ইজি-চেয়ারে ঘনীভূত হয়ে বসলুম। বাড়ীর সব ঘরগুলো অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেছে, শুধু হিন্দুস্থানী চাকর মিশিরের নাসিকা-মন্দ্র নিদ্রা-জগৎ থেকে কী একটা বাণী বহন করে আনছিল। আমারও দুই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে, কিন্তু ঘুমোনোর জো নেই। দৃষ্টিকে সজাগ আর প্রখর করে রেখেছি —বন-বিড়াল একবার এলেই হয়। একটা সিগারেট টানবার দুর্জয় প্রেরণাতেও গলাটা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আগুনের সামান্য একটু দীপ্তি দেখলেও বন-বিড়াল এদিকে আর পা দেবে না। শেয়ালের চাইতেও সতর্ক এবং ধূর্ত—সামান্য ইঙ্গিত পেলেই বাতাসের মতো নিঃশব্দে মিলিয়ে যাবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। একটুকরো চাঁদ আকাশের সীমান্ত রেখায় কখন ডুব মেরেছে, কালো রাত্রির পর্দায় সমস্ত ঢাকা। অন্ধকারে সজাগ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছি কবুতরের বাক্সগুলোর দিকে। কখনো কখনো বক্‌বকুম স্বরে বিহ্বল কূজন শোনা যাচ্ছে, কখন বা আকস্মিক পাখার ঝট্‌পটি। চম্‌কে বন্দুক তুলেই নামিয়ে রাখছি, উত্তেজনায় ছলকে উঠছে বুকের রক্ত।

ঢং ঢং করে বাড়ীর ভেতরে ক্লক সাড়া দিয়ে উঠল। দুটো। তাহলে আজ আর বন-বিড়াল আসবে না, রাত জাগাই বৃথা। এইবারে উঠে শুয়ে পড়া যাক।

কিন্তু ও কী!

অন্ধকারে কী একটা চতুষ্পদ জীব এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে।

যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে তো বন-বিড়াল বলে মনে হচ্ছে না। তবে কি শেয়াল? কিন্তু এ তো শেয়ালের চাইতেও বড়। তবে—তবে কী চিতাবাঘ?

ভয়ে সারা গা ছম ছম করে উঠল। বাঘ আশা আশ্চর্য কী। কয়েক মাইল দূরেই তো সিংহাবাদের হিজলবন, বাঘ আর সাপের আস্তানা। ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম জানোয়ারটা তেমনি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। শুনেছিলুম, অন্ধকারে বাঘের চোখ আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলে, কিন্তু এর চোখ তো এতটুকুও জ্বলছেনা। তা হলে?

উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত। কম্পিত হাতে বরফের মতো ঠাণ্ডা বন্দুকটা হাতে তুলে নিলুম—গ্রীনারের অগ্নি-গর্জন এক মুহূর্তে জাগিয়ে দিলে বাড়ীটাকে।

এক গুলিতেই পড়েছে জানোয়ারটা—চীৎকার করে উঠেছে মর্মান্তিক যন্ত্রণায়। কিন্তু বাঘের গর্জন তো নয়, এযে মানুষের গলা।

—দুলী।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা যত অবিশ্বাস্যই হোক, দুলীই বটে।

গুলিটা ভাগ্যে বুকে লাগেনি, নইলে আমাকে ফাঁসি যেতে হত। কিন্তু বাঁ হাতখানা এমন জখম হয়েছে সে সারা জীবন তা অকর্মণ্য হয়ে থাকবে। বন্দুকের লক্ষ্য আমার সত্যিই ভালো নয়, কিন্তু সেজন্যে আপাতত অনুতাপ বোধ হচ্ছে না।

বীরুয়ার অসুখ খুব বেশি। কবুতরের সুরুয়া নিয়মিত খাওয়াতে পারলে গায়ে বল পাবে এই হচ্ছে, রহিম কবিরাজের বিধান। তাই

ডুলী এইভাবে রোজ রাত্রে বীরুয়ার জন্যে কবুতর সংগ্রহ করতে আসত।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছিনা। মাখন চোর বলে ডুলী তার ঘর ছেড়েছিল, আর বীরুয়ার জন্যে চুরি সে নিজেই করতে এল। তা হলে সেটা কি মাখনকে ছেড়ে আসবার একটা সাময়িক ছুতা মাত্র? অথবা বৃহত্তর প্রেমের কাছে সে নিজের সমস্ত আদর্শকেই আজ নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে?



পাঁচ সের চুণের বায়না। ভোমরার হাতখানা একটু বেশি পরিমাণে ছুঁয়েই এক টাকার নোটখানা গুঁজে দিয়েছে হরিলাল। চমকে ভোমরা তিন পা পিছিয়ে গেছে, নোটখানা উড়ে গেছে হাওয়ায়। মৃদু হেসে সেখানা কুড়িয়ে এনে চালের বাতায় রেখে দিয়েছে হরিলাল। তির্যক কটাক্ষ হেনে বলেছে, মনে থাকে যেন, সাতদিন পরেই কিন্তু বিয়ে।

হরিলাল গ্রামের তালুকদার। জমি আছে, পয়সা আছে। কারবার তো আছেই। যুদ্ধের বাজারে আরো কতদূর কী করেছে ভগবানই জানেন। সুতরাং কুড়ি টাকার চালের দিনেও সে ভালো করেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। অনেক বরযাত্রী আসবে, গাঁয়ের বহু লোকের পাত পড়বে তার বাড়ীতে। পাঁচ সের চুণের কমে এত বড় একটা ক্রিয়াকাণ্ড হওয়া শক্ত। সের প্রতি আট আনা দর সে দিতে চায়, সুতরাং ভোমরাকে একটু বেশি করে স্পর্শ করবার অধিকার তার নিশ্চয় আছে।

কিন্তু ভোমরা ছেলে মানুষ। অধিকার অনধিকারের ব্যাপারগুলো এখনো সে ভালো করে বুঝতে পারে না। হরিলালের লোলুপ চোখ আর অনুভূতিপ্রখর স্পর্শে তার সমস্ত শরীর শির শির করে শিউরে উঠল। খেতু বাড়িতে নেই, দূরের ইষ্টিশানে সোয়ারী নামিয়ে দিতে গেছে। এমন সময় হরিলালের আবির্ভাবটা তার ভালো লাগল না।

সংকীর্ণ জীর্ণ কাপড়ের প্রান্ত আকর্ষণ করে ঘোমটা দেবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলে।

হরিলাল চেহারায় খাটো। হালে ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপরে চিকচিকে একটা টাক নিশানা দিয়েছে। মোটা আর ছোট ছোট হাত পা—আঙ্গুলগুলো সব সময়ে চঞ্চল, কখনো স্থির থাকতে পারে না। মনে হয় তারা যেন সদা-সর্বদা কী একটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় আছে। একবার পেলে আর ছাড়বে না, লোলুপ মুষ্টির ভেতর নিঃশেষে সেটাকে নিষ্পেষিত করে ফেলবে। এক হিসাবে অনুমানটা নির্ভুল। হরিলালের হাতের ভেতর যা একবার এসে পড়েছে তাকে আর কখনো সে ছাড়েনি—খত নয়, জমি নয়, নারীও নয়।

হরিলাল চলে গেলে ভোমরা আরো কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ গাঁয়ের অন্যান্য ভুঁইমালী মেয়েদের মতো চুণ সে-ও তৈরী করে কিন্তু আর সকলের মতো কখনো হাটে বিক্রী করতে যায় না। খেতুই যেতে দেয় না তাকে। ভোমরাকে বিয়ে করেছে এই সেদিন, এখনো নেশা কাটেনি। একহাট লোকের ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে বসে সে বেচাকেনা করবে, ভুঁইমালীর ছেলে খেতুও এটাকে বরদাস্ত করতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ সের চূণের বায়না তাকে নিতেই হবে। ধানের দর এবারেও গত বৎসরের মতো বেড়ে চলেছে ধাপে ধাপে। এ জেলাটা পুরোপুরি দুর্ভিক্ষের এলাকায় পড়ে না, তবু ঘটিবাটি আর রূপার খাড়ু বিক্রী করে গত বছর পেটের দাবী মিটাতে হয়েছে। খেতুর জমি নেই, আধিও নেই, সোয়ারী বয়ে দিন কাটে। গাড়ী ভাড়া পাঁচ থেকে দশ টাকায় উঠেছে বটে কিন্তু জিনিষ পত্রের দামও বেড়েছে

পাঁচগুণ। যথাসর্বস্ব বিক্রী করে দিয়ে গেল বছর ওরা বর্ষাকালের ধকল সামলে নিয়েছে, কিন্তু সে দুর্দিন যদি এবারেও দেখা দেয় তা হলে প্রাণ বাঁচাবার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সোয়ারী বয়ে খেতু যখন গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছল, বেলা তখন দুপুর। শাণ দেওয়া ছুরির মতো রোদ ঝলকাচ্ছে মাথার ওপর। নির্মল আকাশে প্রখর রোদ যেন সমস্ত পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে—হঠাৎ তাকালে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়, মনে হয় পূব থেকে পশ্চিম অবধি সবটা যেন জ্বলন্ত একটা কাঁসার পাত দিয়ে মোড়া। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে যায় অথচ মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। দূরে বাবলা গাছ-গুলোর অপ্রচুর পাতা রোদের তাপে ঝলসে ঝরে পড়েছে—যেন আগুনে পোড়া কতগুলো এলোমেলো ডালপালা শস্যহীন মাঠের মরুভূমির মাঝখান দাঁড়িয়ে।

ময়লা গামছায় কপালের ঘাম মুছে প্রাণপণে 'শাঁটা' হাঁকড়ালে খেতু। 'ডাঁ-ডাঁ-ড্ডাঁহিন'। অস্থিসার গোরুর পাতলা চামড়ার ওপর শাঁটার দগদগে রক্তচিহ্ন ফুটে উঠেছে একটার পর একটা। বাঁ দিকের গোরুটার কাঁধের ওপর জোয়ালের ঘষায় অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘা হয়ে গেছে, সেখান থেকে এখন ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে রক্ত। ডাঁশের দল সেখানে পরমানন্দে ভোজের আসর বসিয়েছে, আর মর্মান্তিক যন্ত্রণায় গোরুটা এক একবার থমকে থেমে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

কিন্তু গোরুর প্রতি দরদের চাইতে প্রয়োজনের তাগিদ অনেক বেশি। ভোরবেলা সোয়ারীকে ইংরেজ বাজারের রেলগাড়ীতে তুলে দিয়ে খেয়েছে চার পয়সার 'লাহরী', আর খেয়েছে টাঙন নদীর এক

পেট জল। অসহ্ ক্ষিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো জড়াজড়ি করছে একসঙ্গে। রাত্রিজাগরণক্লান্ত চোখের পাতাদুটো অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠেছে। আড়ষ্ট একটা আচ্ছন্নতায় শরীর ঢুলে পড়তে চাইছে, কিন্তু ডাঁশ তাড়াবার জন্যে ব্যগ্রকাতর গোরুর লেজের ঘা চটাস্ চটাস্ করে চাবুকের মতো পায়ে লাগতেই চটকা ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে ঘরে ভোমরা ভাত বেড়ে নিয়ে তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'ডাঁ-ডাঁ ডড্ডাঁহিন মহামাই'—শাঁটা উদ্যত করেই খেতুর হাত নেমে এলো আপনা থেকে। সত্যিই কষ্ট হয় গোরু দুটোর দিকে তাকালে; দু' বছর আগে কী চেহারা ছিল ওদের, আর কী হয়ে গেছে। খেতে পায় না। যে গোরু আগে এক দমে পনেরো ক্রোশ পথ অক্লেশে পাড়ি দিয়ে যেত, তারা আজকাল তিন ক্রোশ রাস্তা না হাঁটতেই এমন করে ঝিমিয়ে আসে কেন তার খবর খেতুর চাইতে বেশি করে আর কে জানে!

সামনে তালদীঘি। আমের বন, মহুয়ার গাছ, তালের সারি। এতক্ষণে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। তালদীঘির কালো জল। অপরিসীম স্নিগ্ধতায় যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে—ঠিক যেন ভোমরার শান্ত দু'টি কালো চোখের মতো। জল আর ছায়ার ছোঁয়ায় বাতাসের স্পর্শও মধুর আর শীতল হয়ে উঠেছে। এইখানে গাড়ীটাকে খানিকক্ষণ জিরেন দিলে মন্দ হয় না। অন্তত বলদ দুটোকে একটু জল খাওয়ান দরকার।

একপাশে মুচিপাড়া। এখানে এসে খেতু মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে যায়, নীলাই মুচির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বহুকালের। এখানে এসে গাড়ী থামানোর পিছনে সে আকর্ষণটাও আছে, অন্তত এক ছিলিম তামাক টেনে যাওয়া চলবে।

জোয়াল নামিয়ে প্রথমে বলদ দুটোকে ছেড়ে দিলে খেতু। তারপর বালতী করে জল নিয়ে এল তালদীঘি থেকে। গরুগুলো এক নিশ্বাসে সে জল নিঃশেষ করে দিলে—বুকের ভেতরটা তৃষ্ণায় যেন শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে ওদের। ততক্ষণ গাড়ীর পেছন থেকে কয়েক আঁটি পোয়াল টেনে নামিয়েছে খেতু, কৃতজ্ঞ এবং বেদনার্ত চোখে তার দিকে একবার চেয়ে অনিচ্ছুকভাবে ওরা খড় চিবুতে সুরু করে দিলে। ভাবটা এই, শুকনো খড় যে এখন গলা দিয়ে নামতে চায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল খেতুর। খইল, ভূষি, কলাই ডালের খিচুড়ী—সে সব এখন গত জন্মের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষই না খেয়ে মরে যাচ্ছে তো গোরু। আস্তে আস্তে সে এসে মুচিপাড়ায় পা দিলে।

ঘরের দাওয়াতেই নীলাই বসে আছে। মাথার চুলগুলো বড় বড়, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। বললে, মিতা যে, আয় আয়। তাল-দীঘির পাড়ে দেখলাম গাড়ি থামল একখানা। তোর গাড়ি যে, বুঝতে পারিনি।

আশ্চর্য নিরুৎসুক কণ্ঠ নীলাইয়ের। কথা বলছে যেন নিজের সঙ্গে—নিজের মনে মনেই। তার কথার কোন লক্ষ্য বা উপলক্ষ নেই। সে খেতুর দিকে তাকিয়ে আছে কিম্বা তার পেছনে তাল-দীঘির দিকে অথবা তারও পেছনে রৌদ্র-ঝকিত দিগন্তের দিকে, কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না যেন।

সবিস্ময়ে খেতু বললে, তোর কী হয়েছে মিতা।

—আমার? অত্যন্ত শূন্য খানিকটা হাসি হাসল নীলাই।—আমার কিছু হয়নি।

—কিছু হয়নি তো অমন করে বসে আছিস কেন?

নীলাই আবার তেমনিভাবে তাকাল খেতুর দিকে—অথবা খেতুর ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীন সীমাহীন অনিশ্চিত কোনো একটা দিগন্তের দিকে। বললে, ঘরে একরত্তি চামড়া নেই, কাল থেকে হাঁড়ি চড়েনি। বউকে পাড়ায় পাঠিয়েছি চালের চেষ্টায়। আর বসে বসে ভাবছি মানুষ না হয়ে যদি গোরু ঘোড়া হতাম তা হলে মাঠের ঘাস পাতা খেয়েও বেঁচে থাকা চলত।

একছিলিম তামাক চাইবার কথা খেতুর আর মনে পড়ল না। তার ঘরে আজও খাবার আছে, কিন্তু—দু'দিন পরে তার অবস্থাও যে এমন দাঁড়াবে না কে বলতে পারে! ধানের দর তো বেড়েই চলেছে। নীলাইয়ের পাশে বসতে তার ভয় করতে লাগল। কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে নীলাই—যেন মরা মানুষের চোখ। সে চোখ দুটো ক্রমাগত বলছে—

খেতু দাঁড়িয়ে উঠল। কোনো কথা তার মনে এল না, একটা সান্ত্বনা নয়, একটা আশ্বাসের বাণীও নয়। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে বললে, আমি যাই।

—যাবি? দুটো টাকা দিয়ে যা মিতা। সোয়ারী বয়ে এলি, ভাড়ার টাকা নিশ্চয় পেয়েছিস্। কাল শোধ দিয়ে দেব, আজই কিছু চামড়া আসবার কথা আছে।

চামড়া আসবে কিনা অথবা কাল টাকা সে সত্যিই শোধ দেবে কিনা সে জিজ্ঞাসা খেতুর মনে এল না। আপাতত যেন এই লোকটার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি চায়। ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বের করে নীলাইয়ের হাতে তুলে দিলে খেতু।

কালো কালো ময়লা দাঁত বের করে নীলাই খানিকটা নির্জীব হাসি হাসল। বললে, বাঁচালি মিতা। কাল ঠিক শোধ দিয়ে দেব কিন্তু।

দীঘির পাড়ে দুটো বলদ কার? তোর বুঝি?

—হাঁ, আমার।

—ঈ-স, কী চেহারা ও দুটোর!—

নীলাইয়ের ধোঁয়াটে মৃত চোখ দুটো যেন পলকে জীবন্ত হয়ে উঠল: ওরা তো আর বেশি দিন বাঁচবে না। যদি মরে যায়, চামড়া দুটো আমাকে দিস তাহলে। ভুলে যাসনি যেন। দিবি তো?

মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধে আর আতংকে খেতুর সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, যে টাকা দুটো দিয়েছিল থাবা দিয়ে তা নীলাইয়ের হাত থেকে কেড়ে নেয় আর শাঁটা দিয়ে শপশপ করে ঘা কতক বসিয়ে দেয় অলক্ষুণে লোকটার মুখের ওপর।

কিন্তু খেতু কিছুই করল না। সোজা শন্ শন্ করে হেঁটে এল, জোয়ালে জুড়ে দিল গোরু। নীলাইয়ের চোখের আওতা থেকে পালাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি হোক্ যেমন করে হোক। বলদ দুটো হাঁটতে চায় না। থেমে থেমে দাঁড়ায়, কাঁচা মাটির পথের ধারে যে অপরিপুষ্ট বিবর্ণ ঘাস উঠেছে কালো কালো শীর্ণ আর লম্বা জিব মেলে সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু খেতুর এবার আর রাগ হল না, বিরক্তি হল না এতটুকুও। কী চেহারা হয়ে গেছে এমন নতুন আর জোয়ান গোরুর, ওদের দিকে তাকাতেও ভয় করে এখন হয়ত একবার হাঁটু ভেঙে পড়লে আর উঠতেই পারবে না। হাতের উদ্যত শাঁটা পাশে নামিয়ে সে পরম যত্নে গোরুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কোমল শান্ত গলায় আদর করতে লাগল—লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

যেমন করে হোক মণখানেক খইল এবার জোগাড় করতেই হবে।

বাড়ির দরজায় ফিরে সে 'শিকপায়া' মেরে গাড়ী থামল। আর ওদিকের ডোবার ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে সামনে এসে দাঁড়াল ভোমরা।

অপ্রসন্নতায় ভারী হয়ে উঠল খেতুর মন। বিশ্বাস নেই ভোমরার রূপকে। ভিজে কাপড়ের নেপথ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অপরূপ দেহকান্তি—যার চোখে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তারই নেশা ধরে যাবে।

—এখন আবার চান করলি যে? এই অবেলায়?

—ঝিনুক কুড়ুতে গিয়েছিলাম।

—ঝিনুক কুড়ুতে! খেতুর কপাল উঠল রেখাসংকুল হয়ে, আরো বেশি অস্বস্তিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।—আজকে ঝিনুক দিয়ে কী হবে?

—হরিলাল টাকা দিয়ে গেছে। পাঁচ সের চূণের বায়না।

হরিলাল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরক্তি ঝিমিয়ে পড়ল, ধুলোপড়া খাওয়া সাপের মতো মাথা নত করল যা কিছু উত্তেজনা। নামটার যাদু আছে। হরিলাল দাস এ গ্রামের শুধু মণ্ডল নয়, মণ্ডলেশ্বর; মহারাজ চক্রবর্তী বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। উপকার কী করে? বলা শক্ত, তবে অপকারের ক্ষমতা যে তার সীমানাহীন এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ-প্রয়োগই দরকার হয় না। এ হেন হরিলাল ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেবে—উপচার অনুষ্ঠানে এতটুকুও ফাঁক রাখবে না কোথাও। পাঁচ সের চুণের বায়না না নিয়ে উপায় কী।

—ওঃ। কিন্তু তুই যে খেটে মরে যাবি বউ।

ভোমরা মৃদু হাসল, বিস্বাদ নিরানন্দ হাসি। তারপর কাপড় ছাড়বার জন্যে চলে গেল ঘরের ভেতর। অসীম ক্লান্তিতে দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল খেতু।

—খিদেয় মরে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি দু'টি খেতে দে ভোমরা।

একটা মাটির ঘটিতে করে জল আর কচুপাতায় খানিকটা নুন এনে ভোমরা রাখল খেতুর পাশে। সেদিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই খেতুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কাঁসা আর পিতল যা ছিল সব বন্ধক গেছে, ঘরের লক্ষ্মী আর কোনদিন ঘরে ফিরবে না।

ওদিকে রান্না ঘরের ঝাঁপ খুলেই ভোমরা থেমে দাঁড়াল। পা আর নড়ে না।

—কিরে, হল কী?

কী জবাব দেবে ভোমরা। পেছন দিকের জিরজিরে বেড়া ফাঁক করে কখন ঘরে ঢুকেছিল কুকুর। হাঁড়ি কলসী সব ভেঙে একাকার করে দিয়েছে, রাশি রাশি ভাত আর ডাল ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। ডাল মেশানো কর্দমাক্ত মাটিতে এখনো ফুটে রয়েছে কুকুরের নোংরা পায়ের এলোমেলো খাবার দাগ। ঝিনুক আনতে যখন সে বিলের দিকে গিয়েছিল, সেই ফাঁকেই কখন—

ব্যাপারটা দেখে খেতুও স্তব্ধ হয়ে রইল। দোষ নেই কারোই—পাঁচ সের চুণের বায়না দিয়ে গেছে হরিলাল। ভোমরাকে কষে একটা লাথি মারবার জন্যে হিংস্র একটা পা তুলেই নামিয়ে নিলে খেতু। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, বেশ।

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ভোমরা বললে, তুমি বোসো। আমি আবার চারটি—।

—থাক, থাক, চাল সস্তা নয় অত। কত লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে খবর রাখিস তার?

মনের সামনে নীলাই এসে দেখা দিলে। মড়ার মতো দুটো দৃষ্টিহীন অথচ অদ্ভুত দূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলে যেন কিছু একটা বলবার

চেষ্টা করছে—যেন তার সর্বাঙ্গ ঘিরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা অশুভ অভিশাপের ইঙ্গিত। এ কি সেই জন্যেই ?

ট্যাঁকে টাকা আছে তিনটে, তাড়ির দোকানও খোলা আছে এখনো—যেখানে সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণার নির্বাণ, যেখানে অনায়াসে সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তিকে ভুলে থাকা চলে। হন্ হন্ করে খেতু বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

ঘরের খুঁটি ধরে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল ভোমরা। সারাদিন তার পেটেও কিছুই পড়েনি ; নদীর ধারের গরম বালিতে পায়ের নীচে ফোস্কা পড়ে যায়, বিলের ওপরে রৌদ্রতপ্ত আকাশ যেন হাড়-মাংস এক সঙ্গে সেদ্ধ করতে থাকে। খেতুর জন্যে না হয় তাড়ির দোকান খোলা আছে, কিন্তু তার ? ভোমরার চোখ ফেটে জল নয়—মনে হল টপ টপ করে কয়েক বিন্দু টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়বে।

উঠোনে স্তূপাকার ঝিনুক। খানিকটা স্যাঁৎসেতে আঁশটে গন্ধ খালি ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

রাত্রেই আবার সব সহজ হয়ে গেল। তাড়ির নেশা অদ্ভুতভাবে বদলে দিয়েছে খেতুকে। স্নেহ আর আবেগে সমস্ত মনটা কোমল আর আবেশবিহ্বল হয়ে উঠেছে। সোহাগে সোহাগে ভোমরাকে অস্থির করে দিয়ে জড়িত গলায় বললে, রাগ করিসনি বউ, রাগ করিসনি। তোকে কত ভালোবাসি আমি।......

পরের দিন বেলা উঠবার আগেই বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরোল খেতু। রোহনপুরের হাটে কিছু মাল পৌঁছে দিতে হবে। মণ প্রতি বারো আনা দর ধরে দিয়েছে মহাজন। আধ সের চালের ভাত খেয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে একটা বিড়ি ধরাল,

তারপর অনেকক্ষণ ধরে সপ্রেম চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভোমরাকে।

—তোর জন্যে হাট থেকে কাপড় কিনে আনব বউ।

ভোমরা মৃদু ক্লান্ত রেখায় হাসল। কালকের জের আজও শরীরের ওপর থেকে মেটেনি। কোনখানে যেন আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই এতটুকুও।

—ফিরবে কখন ?

—ভোরের আগেই। সাঁঝ রাত্তিরে ওখান থেকে গাড়ি জুড়ে দিলে এ ক' কোশ ঘাঁটা আর কতক্ষণ। তুই কিন্তু তাই বলে রাত জেগে বসে থাকিসনে।

খেতু গাড়ি নিয়ে চলে গেল। রান্নাঘরের ভাঙা যায়গাটা পিঁড়ি আর ইট দিয়ে বন্ধ করে ভাতের হাঁড়িটা শিকেয় তুলে রেখে ভোমরাও উঠোনে এসে দাঁড়াল। আরো অন্তত দু'তিন সাজি ঝিনুক দরকার। কাল থেকেই পোড়ানো স্থরু করতে হবে।

—খেতু বাড়িতে আছিস ?

হরিলালের গলা। ভোমরা ত্রস্ত হয়ে ঘোমটা টেনে দেবার আগেই হরিলাল বাড়ির ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।—খেতু নেই বাড়িতে ?

ভোমরা মাথা নেড়ে জানালে, না। হরিলাল কিন্তু চলে গেল না। নিজেই একটা চৌপাই টেনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল ঘরের দাওয়াতেঃ চূণের কথা ভুলে যাসনি তো ?

—না।

—ভুলিসনি। তোর ওপর ভরসা করে বসে আছি। বিয়ের দিন যাবি কিন্তু আমার বাড়িতে। খেটেখুটে আর খেয়ে-দেয়ে আসবি।

ভয় আর অস্বস্তিতে ভোমরা চঞ্চল হয়ে উঠল। হরিলাল বড় বেশি তীব্র আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে। গলার স্বরে বড় বেশি কোমলতার আমেজ লেগেছে। পুরুষের ঐ চোখ আর কণ্ঠস্বরের অর্থ বুঝতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না মেয়েদের। সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যোগাযোগে ভোমরার অপাঙ্গ চোখ গিয়ে পড়ল হরিলালের হাতের ওপর। মোটা মোটা আঙুলগুলো যেন কিছু একটাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলতে চায় তাকে।

—একটা পান খাওয়াতে পারিস খেতুর বউ?

—না।—চাপা শক্ত গলায় ভোমরা জবাব দিলে, পান নেই।

হরিলাল মৃদু হাসল—চোখ দুটো ঝলক দিয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে। তৈলাক্ত গোলাকার গালের ওপর দুটো বৃত্ত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মুখে সামনের পাটিতে একটা তীক্ষ্ণধার গজদন্ত চকিতের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

—তবে থাক, পানের দরকার নেই।—

হরিলালের হাতখানা কঠোরভাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল: খেতুকে বলে দিস ঋণ সালিশীর মামলাটায় ওর জন্যে বোধ হয় কিছু করা যাবে না।

ভোমরার বুকের ভেতর ধড়াস করে যেন ভারী একখানা পাথর এসে পড়ল। হরিলালের হাতে শাণিত খড়্গ হত্যার উল্লাসে ঝক ঝক করে উঠেছে। রামসই ঋণ সালিশী বোর্ডের সে প্রতিপত্তিশালী সদস্য, চেয়ারম্যান তার খাতক। আর বলদ কিনবার জন্যে ইদ্রিস মিঞার কাছ থেকে যে বায়ান্ন টাকা ধার করেছিল খেতু, সে মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে রামসই ঋণ সালিশী বোর্ডেই। হরিলালের একটি মাত্র

ইঙ্গিতে বলদ দু'টি বিক্রী করে দিয়ে কালকেই হয়ত কিস্তি শোধ করতে হবে খেতুকে। আরও কত কী হতে পারে একমাত্র হরিলালই তা জানে।

—বসুন, পান দিচ্ছি।

হরিলাল আবার হাসল। বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ—একটি মাত্র অস্ত্র দেখিয়েই জয়লাভ। এমন অসংখ্য অগণ্য অস্ত্র আছে হরিলালের যা খেতু কোন দিন কল্পনাও করতে পারে না।

—নাঃ থাক। আমারও কাজ আছে, উঠতে হবে। খেতু বাড়ি আসবে কখন?

—ভোর রাতে।

হরিলাল এগিয়ে এল অসংকোচে এবং নির্ভয়ে। বিস্তারিত ভূমিকা বা ভণিতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এখন—সে কাজের মানুষ। নীরব আর নির্জন বাড়ি। ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঝিমিয়ে পড়েছে সমস্ত। পেছনের আমগাছে একটা পাখী ডাকছে, বৌ কথা কও।

লোলুপ আর কঠিন মুষ্টি একখানা মাংসাশী-থাবার মতো ভোমরার হাত আঁকড়ে ধরলে। মট করে উঠল এক গাছা কাঁচের চুড়ি, দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। চাপা রুদ্ধ গলায় হরিলাল বললে, সন্ধ্যের পরে আমি আসব। কোনো ভয় নেই তোর।

ভোমরার সর্বাঙ্গে যেন একটা বিষধর সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মুখ দিয়ে কথা ফুটতে চায় না। শুধু তার আতংকবিহ্বল মুখের ওপর সাপের প্রসারিত ফণা দুলছে, লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের বিন্দু। কিন্তু চোখ সাপের নয়, হরিলালের।

—কোনো ভাবনা নেই। টাকা-পয়সা, কাপড়-চুড়ি, যা চাস। কিন্তু সন্ধ্যের পরে আমি আসব।

ভোমরার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

না ফুটল, কী আসে যায় তাতে। নিপুণ ঘাতক হরিলাল, তার অস্ত্রের আঘাত অব্যর্থ আর অনিবার্য। বায়ান্ন টাকার মামলাটা ভুলে থাকা এত সহজ নয় খেতুর পক্ষে। আরো একটু প্যাঁচ কষালে খেতুই উপযাচক হয়ে ভোমরাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে। এমন সে অনেক দেখেছে। কিন্তু কী দরকার অতটা করে। হাঙ্গামা তার ভালো লাগে না। সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করতেই সে ভালোবাসে—লোক একেবারে খারাপ নয় হরিলাল।

একখানা বড় মাঠ পেরোলেই সামনে মুচিপাড়া। আকাশের রোদ যেন আগুনের মতো গলে গলে পড়ছে। ময়লা গামছায় খেতু কপালটা মুছে ফেললে। চারিদিকের মাঠে ঘাটে চলেছে অদৃশ্য অগ্নিবজ্ঞ। এখনো মেঘ দেখা দিল না, বৃষ্টি নামল না এক পশলা! কবে যে লাঙল পড়বে মাঠে। ধান রোয়ার সময় চলে গেল, অসময়ে বৃষ্টি পড়লে ফসল বুনেই বা কী লাভ। ধানে 'ঝুলন' লাগবে না, হাজা ধরে শুকিয়ে যাবে সমস্ত।

কেমন একটা অশুভ আশংকায় মনটা ভারী হয়ে উঠল খেতুর। পথের পাশে আলের ওপর সাদা ধবধবে একটা নরকপাল; দৃষ্টিহীন চোখের কালো গহ্বরের ভেতর দিয়ে ওর দিকে যেন প্যাঁট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। কোনো গোরস্থান থেকে শেয়ালে টেনে এনেছে নিশ্চয়ই।

—ডাঁ-ডাঁ-ড্ডাঁহিন।

গোরুর লেজে মোচড় লাগল, আকস্মিক ভাবে ছুটতে সুরু করলে গাড়িটা। বাঁ দিকের বলদটার রক্তাক্ত কাঁধের ওপর ডাঁশগুলো ভন ভন করে উড়তে লাগল।

মুচিপাড়ার সামনে আসতেই মনে পড়ে গেল টাকা দুটোর কথা। আজকেই শোধ দেবার কথা বলেছিল নীলাই। কিন্তু নীলাইয়ের সেই মুখখানা কল্পনা করতেই গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠল। কালকের দিনটা কি সেই জন্যেই কাটল অনাহারে।

হাঁক দিতেই নীলাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খুশি হয়ে বললে, মিতা যে। কোথায় চললি আবার ?

—মাল নামাতে যাব, রোহনপুরে। টাকা দুটো দিবি বলেছিলি।

—টাকা? সে হবে। আয় বোস, তামাক টেনে যা এক ছিলিম।

নীলাইয়ের চেহারায় অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ছে আজকে। কথার ভঙ্গিতে আবার যেন পুরোনো মিতাকে খুঁজে পাওয়া গেল। হয়তো চামড়া পেয়েছে কিছু অথবা সেই দুটো টাকাই এমন রূপান্তর ঘটিয়েছে তার। কিন্তু কারণ যাই হোক, মনের ওপর থেকে মস্ত একটা ভার যেন নেমে গেল খেতুর।

—কিন্তু এখন গাড়ি বাঁধতে পারব না। মাল আছে সঙ্গে।

—রেখে দে তোর মাল।—নীলাই ভ্রূভঙ্গি করলে: আধ ঘণ্টা বসে গেলে এমন কী হবে। যা রোদ্দুর, গরু দুটোকেও একটু জিরোন দে বরং। কালকে তুই এলি অথচ তোকে একটু তামাক খাওয়াতে পারলাম না—ভারী খুঁত খুঁত করছে মনটা।

সত্যিই অসম্ভব রোদ্দ। বেলাটা একটু ঠাণ্ডা না হলে গাড়ি হাঁকানো শক্ত। বলদগুলোর ভারী ভারী নিশ্বাস পড়ছে, দেখলেও কষ্ট হয়। তা ছাড়া কী চমৎকার নীলাইয়ের ঘরের দাওয়াটা। মহুয়া গাছের ছায়া পড়েছে, ঝির ঝির করে গান গাইছে পাতা। তালদীঘি থেকে ভিজে হাওয়া উঠে আসছে। শুধু বসা নয়, খানিকটা গড়িয়ে নিতেও ইচ্ছে করে। বলদ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে খেতু এসে বসল।

—পেলি চামড়া ?

—নাঃ। নীলাইয়ের বুকের ভেতর থেকে ঝোড়ো হাওয়ার মতো শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল : আজও এল না ব্যাপারীরা। এবারে কপালে কী আছে কে জানে। সকালে ঘোষগাঁয়ে ঢোল বাজিয়ে এলাম, আট গণ্ডা পয়সা দিলে। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে। আচ্ছা, যুদ্ধ কবে থামবে বলতে পারিস ?

মহুয়ার ঝির ঝিরে হাওয়াটা বড় আরাম বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে ধরে। কিন্তু নীলাইয়ের কথাগুলো এই নিশ্চিন্ত প্রশান্তির মাঝখানে সাঁওতালী তীরের মতো এসে বেঁধে, বিষ বর্ষণ করে। মনে পড়ে যায় ওর মামাতো ভাই বিষ্টুকে বুনো শূয়োরে গুঁতিয়ে মেরেছিল—পেটের চামড়া ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়িগুলো ঝুলে পড়েছিল বাইরে; চৌকীদার আলী মহম্মদকে ডাকাতেরা ধরে জবাই করে দিয়েছিল, রক্তাক্ত গলাটা আধ হাত ফাঁক হয়েছিল একটা রাক্ষুসে হাঁয়ের মতো। নীলাইয়ের সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন যত অপঘাত, যত অপমৃত্যু আর যত অভিশাপ এসে প্রেতের মতো ছায়া ফেলেছে।

—যুদ্ধ কবে থামবে ? ভগবান জানেন।

—তা বটে। ভগবান জানেন—ভগবান! হিংস্রভাবে কথাটার প্রতিধ্বনি করলে নীলাই।

ঘরের ভেতর থেকে তামাক সেজে নিয়ে এল ওর বউ। চকিতের জন্যে মিতানের সরু সরু পা দুটো চোখে পড়ল খেতুর। কী অসম্ভব রোগা—এত রোগা হয়ে গেছে বউটা। মুখের দিকে তাকাতে ভরসা হয় না, অকারণে চেতনাকে চমকে দিয়ে মনে হল ওর মুখে হয়তো সেই মড়ার খুলিটার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ভোমরা এখনো তাজা আছে, এখনো যৌবনের ঐশ্বর্যে টলমল করছে সে। কিন্তু—।

দা-কাটা তামাকের উগ্র গন্ধটা লোভনীয়। কিন্তু হুঁকোতে একটা টান দিয়েই খেতু সেটা বাড়িয়ে দিলে নীলাইয়ের দিকে।

—না, মিতা, খা তুই। কিছু ভালো লাগছে না আমার।

ভালো লাগছে না কারোই। ভালো লাগবার কথাও নয়। অন্যমনস্কভাবে নীলাই কল্‌কেটাকে উবুড় করে দিলে। তারপর তাকিয়ে রইল দূরে খেতুর অস্থিসার বলদ দুটোর দিকে। যা চেহারা হয়েছে ওদের, বেশিদিন আর বাঁচবে না। ওই দুটো গোরুর চামড়া পেলে—।

খেতু বললে, নাঃ, উঠি এবার। চার ক্রোশ ঘাঁটা যেতে হবে।

—বোস মিতা বোস। এত তাড়া কিসের? তুই তো সুখী মানুষ, একদণ্ড নয় এখানে বসেই যা। ঘরে ঠাণ্ডা আছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে যাবি নাকি?

—ঠাণ্ডা? তাড়ি?—মুহূর্তে সমস্ত মনটা যেন নেচে উঠল। কিন্তু তাড়ির নেশায় ধরলে সব কাজ একেবারে পণ্ড। বহু টাকার মাল রয়েছে গাড়িতে। রাত বিরেতে সাঁওতাল পাড়ার পথঘাট আজকাল একেবারেই ভালো নয়। অভাবের তাড়নায় লোকগুলো ক্ষেপে রয়েছে হন্যে কুকুরের মতো। কায়দায় পেলে লুটেপুটে নেওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।—

—এত গরমে একটুখানি ঠাণ্ডা পেলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু নেশা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে রে। পথ ভারী খারাপ আজকাল।

—একটুখানি গলা ভিজিয়ে যাবি, নেশা হবে কেন।

—তা তা মন্দ নয় কথাটা।—সলোভে খেতু চাটল ঠোঁট দুটো।

মাটির ভাঁড়ে করে এল গাঁজিয়ে ওঠা তালের রস। আর কটুগন্ধী

সেই অম্লমধুর অমৃত পেটে পড়তেই খেতু ভুলে গেল সমস্ত। রোহনপুরের ইষ্টিশান, মাল বোঝাই গাড়ি, রাত্রির অন্ধকারে শংকা-সংকুল সাঁওতালপাড়া···কোনো কিছুই আর মনে রইল না। ভাঁড়ের পর ভাঁড় উজাড় করে নেশায়:আর ক্লান্তিতে খেতুর সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে এল অতি গভীর অবসাদে। কী ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে নীলাইয়ের দাওয়ায় —আর কী মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে মহুয়ার কচি কোমল পাতাগুলো।···

তারপরে বেলা গড়িয়ে এল—সূর্য নামল পশ্চিমের দিগন্তে। মহুয়া পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রাঙা আলো বাঁকা হয়ে খেতুর মুখের ওপর এসে পড়তেই যেন আচমকা ভেঙে গেল ঘুমটা। ধড়মড় করে উঠে বসল খেতু। তাইতো, বেলা একেবারে নেমে পড়েছে যে। রাত দুপুরের আগে আর ইষ্টিশানে পৌছোনো চলবে না।

সামনে বসে নির্বিকার মুখে বিড়ি খাচ্ছে নীলাই।

—ঈস! কী ঘুমটাই ঘুমোলি মিতা। বেলা একেবারে কাবার।

হাত পা কাঁপছে, মাথাটার ভার যেন বইতে পারা যায় না। হঠাৎ নীলাইয়ের ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে খেতুর মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠল।

—তুই তো আমাকে এই ফ্যাসাদে ফেললি। কতদূরে যেতে হবে এই রাত্তিরে—দ্যাখতো। ওকি!

ভয়ে বিস্ময়ে খেতুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল আর পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল নীলাইয়ের মুখ—বলদ দুটো অমন করছে কেন?

দ্রুত পায়ে খেতু ছুটে এলো বলদের কাছে। একটা তখন হাত পা ছড়িয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, দুটো চোখের ওপর নেমেছে সাদা পর্দা, সারা গায়ে ভন্ ভন্ করে উড়ছে মাছি। আর একটা অন্তিম চেষ্টায় আকাশের দিকে মুখ তুলে নিশ্বাস টানছে, জিভ

বেরিয়ে এসেছে, কালো দীর্ঘায়ত চোখের কোণায় টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু।

—আমার বলদ মরে গেল!—আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করে খেতু আছড়ে পড়ল বলদের গায়ে। চর্মসার প্রকাণ্ড পাঁজরার হাড়গুলো মটমট করে উঠল বুকের চাপে।

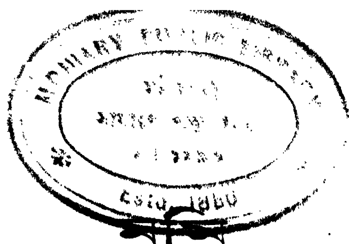
নীলাই নিরাসক্ত গলায় বললে, যে গরম, সর্দি-গর্মি—।

—সর্দি-গর্মি?—ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো খেতু বিদ্যুৎ বেগে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। সামনে একটা মাটির পাত্রে ভুষি মেশানো হলুদ রঙের খানিকটা দুর্গন্ধ জল। এই জল কে খেতে দিয়েছিল বলদকে, কে দিয়েছিল?

—সর্দি-গর্মি! শা—লা, চামড়ার লোভে আমার গোরুকে বিষ খাইয়েছিস, বিষ খাইয়েছিস তুই। শালা গো-হত্যাকারী, আমি খুন করব, খুন করে ফেলব তোকে।—খেতুর গলা চিরে আকাশের বাজ গর্জে উঠল: আজ যদি তোর রক্ত না দেখি তা হলে ভুঁইমালীর বাচ্ছা নই আমি।

বেলা গড়িয়ে এল, সন্ধ্যার ঘন ছায়া নিঃশব্দে নামল মাটিতে। কালো রাত্রির ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে হরিলাল খেতুর দরজায় এসে দাঁড়াল। হরিলাল জানে ভোমরা তাকে ফেরাতে পারবে না, নিজেকে বাঁচাতে পারবে না তার কঠিন মুষ্টির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ থেকে। তার হাতে যে খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে, খেতুকে বধ করতে তার একটিমাত্র আঘাতই যথেষ্ট।

অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে বহু দূরে উত্তরের আকাশটা বিচিত্র রক্তিমছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন ছড়িয়ে পড়ল সদ্যোনিহত একটা মানুষের টাটকা খানিকটা তাজা রক্ত। কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়।



মমি

একটা চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে কুৎসিত ব্যাধিতে, অস্বাভাবিক-ভাবে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে নাকটা। শরীরের সমস্ত মাংস শুকিয়ে যেন ছিবড়ের রূপ নিয়েছে। মোটা হাড়গুলো চামড়ার আবরণ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। লিভারে সিরোসিস্ দেখা দিয়েছে—মধ্যে মধ্যে সুতীব্র বেদনার এক-একটা অসহ্য তরঙ্গ উঠে যেন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিয়ে যায়।

এক কথায় কক্ষচ্যুত উল্‌কা। আভিজাত্যের অগ্নিজ্বালায় নিজেকে নিঃশেষে দাহন করে প্রতীক্ষা করছে অস্তিমের। আর প্রতীক্ষা করছে মণীন্দ্র। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় এমনি করেই বেঁচে আছেন—পাঁচ বছর ধরে বেঁচে আছেন। অবশ্য এ বাঁচার মূল্য নেই কিছু, রত্নেশ্বর নির্বাক, অপটু, প্রায় স্থবির। তবুও কোথায় যেন বাধে মণীন্দ্রের। এ যেন মিশরের 'মমি'—জীবন নেই অথচ জীবনাতীত একটা সত্তা অশুভ অভিশাপের মতো তাকে বেষ্টন করে আছে। কোন সচেতন—সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি নয়, একটা বিচিত্র অলক্ষ্য শাসন থেকে থেকে মনের ওপর মেঘের মতো ছায়া ফেলে যায়।

বস্তুবাদী মণীন্দ্র জিনিষটাকে উড়িয়ে দিতে চায়—নিজের সংশয়ের কুসংস্কারকে আঘাত করে বারে বারে। কিন্তু অনেক রাত্রে নিজের ঘরে বসে লেখাপড়া করতে করতে হয়তো আচমকা চোখ চলে যায় ওপরের মহলে, রত্নেশ্বরের ঘরের দিকে। বিরাট বাড়িটা ঘন অন্ধকারে

আচ্ছন্ন, নিবিড় প্রসুপ্তি ; শুধু একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে রত্নেশ্বরের ঘরে আর তারই সঙ্গে মনে হয়, কে যেন ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দে পদচারণা করছে সেখানে। আর মনে হয়, যেন সেই ছায়ামূর্তিটা অস্বাভাবিক রকমের আকার নিয়ে বেড়ে উঠছে—বেড়ে উঠছে—তারপর বাইরের অতলান্ত কালো অন্ধকারে তার দেহটা মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্তের মধ্যে।

স্পন্দিত বুকে বেরিয়ে আসে মণীন্দ্র—চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করে নিজেকে। হঠাৎ যেন ঘোর ভেঙে যায় একটা। কলমে কালি পুরে নিয়ে মণীন্দ্র নতুন করে লিখতে বসে :

"সমাজে ও রাষ্ট্রে পূর্ণরূপ বিপ্লব সৃষ্টির জন্য ধনতন্ত্রকে জোড়াতালি দিয়া সারাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। তাহাকে নির্মূল করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। যে দস্যুতার উপর ভিত্তি করিয়া পুঁজীবাদ—"

মন জেগে ওঠে—জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে চোখ। নতুন—পৃথিবী—সূর্যালোকিত দিগদিগন্ত। ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে অস্ত্রের অট্টহাসি নয়—গুচ্ছে গুচ্ছে আঙুর, জলপাই পাতার ঘন শ্যামলতায় মৃদু মর্মর ; ট্যাঙ্ক নয়—ট্রাক্টারের চাকায় লক্ষ বিঘার জমিতে যৌথ-মানুষের সোনার ফসল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

রত্নেশ্বর রায় কি মণীন্দ্রকে বুঝতে পারেন ? কে জানে।

অন্তত বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। হাতে একটা লাঠি নিয়ে তিনি ঠুক ঠুক করে ঘরের বারান্দায় পায়চারী করে বেড়ান। চোখে ভালো দেখতে পান না, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিও আজ সীমাবদ্ধ

হয়েছে দশহাত জমির মধ্যে। শুধু কি চোখ? হয়তো মনও। তাঁর নিজের ছোট ঘরটি—যেখানে সাদা পাথরের টেবিলে ব্রোঞ্জে তৈরী ভেনাসের একটা নগ্নমূর্তি, আর দেওয়ালের গায়ে বিরাট গুম্ফ-পাগড়িতে শোভিত রামেশ্বর রায়ের একখানা বিবর্ণ তৈলচিত্র—দৃষ্টি আর মনটা যেন তারই ভেতরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। ভেনাস তাঁর উন্মত্ত যৌবনের প্রতীক আর রামেশ্বর রায় তাঁর আদর্শ পিতৃপুরুষ—উচ্ছৃঙ্খল আভিজাত্যের দিক্‌-জোতিষ্ক।

নীচে মণীন্দ্রের ঘর থেকে তুমুল কোলাহল শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। ইংরেজী-বাংলায় মেশানো সমুত্তাল আলোচনা। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে, আসে আকাশ কাঁপানো অট্টহাসি। সে হাসির শব্দে রত্নেশ্বরের বুকের ভেতরটা যেন চমকে ওঠে। একটা অতি তীব্র আশংকার মতো মনে হয়, ভালো কাজ করছে না মণীন্দ্র—মণীন্দ্র চলছে না তার বংশের নির্দিষ্ট বাঁধা শড়ক দিয়ে। এত লোক এসে তার কাছে ভিড় করে কেন, কী চায় তারা? মণীন্দ্র মদ খায় না, নিশিরাত্রে তার ঘর থেকে নিঃশব্দচরণে কোন অভিসারিকা বেরিয়ে যায় না কখনো। কিন্তু কেন মদ খায় না মণীন্দ্র, কেন সে যাপন করে মূর্খের মতো অতি-সংযত, অতি-নিয়ন্ত্রিত জীবন? রত্নেশ্বরের মনে হয়, কোথায় যেন সুত্র কেটে গেছে—বংশধারার ক্রমিক-শৃঙ্খলের একটা আংটা মাঝখান থেকে খসে পড়েছে কোথাও। উচ্ছৃঙ্খল হোক মণীন্দ্র—অসংযত হোক—নিজের অস্তিত্বটাকে একটা অতি তীব্র দীপ-শিখার মতো বিস্তীর্ণ আর বিকীর্ণ করে দিক।

দেয়ালের গায়ে রামেশ্বর রায়ের তৈলচিত্রে কীটের আবির্ভাব টের পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জের তৈরী ভেনাসের মূর্তি কালো হয়ে আসে তার উদ্ধত স্তনাগ্রে মাকড়সারা জাল বুনে চলে। যেন নিরাবরণতাকে

ঢেকে দেবার জন্যে একটা মস্‌লিনের কাঁচুলি দিয়েছে পরিয়ে। রত্নেশ্বর রায়ের মনে হয়, মণীন্দ্রের ভেতরেও কোথাও এই কঞ্চুকের বিস্তৃতি ঘটছে—অসংকোচ লালসা আর নগ্নতার দিন কি শেষ হয়ে গেল!

ধীরে ধীরে টিপয়টার দিকে এগিয়ে আসেন রত্নেশ্বর। টুকিটাকি বিচিত্র সরঞ্জাম সেখানে। দুটো হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। অ্যাল্‌কোহলের ভেতরে ডোবানো একরাশ ছুঁচ। কাঁচের ছিপি-আটা নীল রঙের শিশিতে মর্‌ফিয়া। লিভারে কীটদষ্ট ক্ষত বহন করে মদ খাওয়া আজ তাঁর নিষিদ্ধ। কিন্তু রক্তের মধ্যে যখন অভ্যস্ত নেশা তার দাবী জানায় তখন সে দাবী মেটাতে হয় মর্‌ফিয়া ইন্‌জেক্‌শনের সাহায্যে। সিরিঞ্জটা ঠিক করে মর্‌ফিয়া পুরলেন রত্নেশ্বর, তারপর বাহুতে তার তীক্ষ্ণাগ্র বিদ্ধ করে চাপ দিলেন পিষ্টনে। মুখের একটি রেখারও স্থানচ্যুতি ঘটল না, কোথাও ভাবান্তর দেখা দিল না এতটুকু। সামান্য একটা কাঁটার আঁচড়ে বেদনা বোধ করবার রীতি রায়বংশের নয়।

মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল রক্ত। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল, শ্লথ শিরা-উপশিরার পথে যেন অপহৃত যৌবনের বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। একদৃষ্টিতে ভেনাসের ব্রোঞ্জ মূর্তিটার দিকে তাকালেন রত্নেশ্বর। দেড় ফুট একটা মূর্তিকে আশ্রয় করে লালসার বহ্নিময় তীব্রতা ফুটিয়ে তুলেছে ভাস্কর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে একদা যখন তিনি বাগান বাড়িতে রাত কাটাতেন—সেই সব দিনে সাহেবী দোকান থেকে কেনা এই মূর্তি। উঃ—কী যে সব দিনগুলো! তারা কি কখনো আর তাঁর জীবনে ফিরে আসবে না, ফিরে আসা এতই কি অসম্ভব?

দরজায় বেজে উঠল লঘু পদধ্বনি।

—কে?

—আমি জয়া।

জয়া। অতীত যৌবনের মধ্যে জেগে উঠতে গিয়েই যেন একটা প্রবল আঘাতে রত্নেশ্বর আবার ঝিম মেরে গেলেন। সে জয়া আর নেই। যে-সব রাত্রে তরুণী জয়ার দেহ জ্বলত মশালের মতো, সে-সব রাত প্রভাত হয়ে গেছে! জয়া আজ সম্পূর্ণ নির্বাপিত—বরফের মতো শীতল আর নিরুত্তাপ। অথচ কী আশ্চর্য, মণীন্দ্রের মা মারা যাওয়ার পরে তাঁর বহির্মুখী যৌবন অনেকটা জয়ার মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। জয়ার ভেতরে কী ছিল রত্নেশ্বর আজ তা ভুলে গেছেন—কিন্তু যা ছিল তা যে তাঁকে অনেকখানিই এক-চারণার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, একথা আজও মনে আছে।

সেই জয়া। কী কুৎসিত দেখাচ্ছে তাকে। শরীর মেদবহুল, দাঁতে মিশি। রত্নেশ্বরের দেওয়া আড়াই ভরির তাগা বাহুতে যেন কেটে বসেছে। অস্বাভাবিক মোটা কোমরের কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ভারী এক ছড়া রূপোর গোট দেখা যাচ্ছে। জয়া হাসল। কিন্তু সমস্ত মনকে আকুল আর বিহ্বল করা হাসি সে নয়—কালো আর বীভৎস হাসি।

—কী চাই জয়া?

—তোমাকে বিরক্ত করতাম না, জানি তোমার শরীর খারাপ: জয়া যেন বিনয় করবার চেষ্টা করল খানিকটা। রত্নেশ্বরের মুখে সকৌতুক ব্যঙ্গের আভাস দেখা দিল—জয়াও বিনয় করে। অথচ একদিন কাপড় গয়না পাওয়ার জন্যে সে না করেছে এমন ব্যাপারই নেই। যা দিয়েছে তার দশ গুণ সুদে আসলে উসুল করে নেবার চেষ্টার ত্রুটি করে নি সে।

—ভদ্রতা করতে হবে না, যা বলতে এসেছিলে বলো।

জয়া অতীতের মতো আবার সেই মোহিনী হাসি হাসবার চেষ্টা করলে, চোখে আমেজ দিতে চাইল সেদিনকার সেই মাদকতার। কিন্তু কিছুই ফুটল না—ব্রোঞ্জের মূর্তিটার সঙ্গে তুলনা করে রত্নেশ্বরের মন সংকোচে পেছিয়ে গেল যেন।

রত্নেশ্বরের বিছানার একপাশে বসে পড়ে জয়া বললে, এতদিন পরে এলাম, একবারটি বসতেও বললে না ?

রত্নেশ্বর তিক্তভাবে হাসলেন : বসতে না বললেও তুমি বসবে, এ আমি জানতাম।

জয়া ঠোঁট ফোলাবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করলে অর্থাৎ কালো ঠোঁট দুটোয় রূপায়িত হল একটা বীভৎস ভঙ্গি।

—এখন তো আমাকে মনেই ধরবে না, কিন্তু এমন দিনও ছিল যখন এই গোয়ালার মেয়ের পা দুখানা তুমি মাথায় করে রাখতে চাইতে।

—কিন্তু সে আমি আর বেঁচে নেই, সে তুমিও শেষ হয়ে গেছ অনেক কাল আগে। বিরক্তিভরে রত্নেশ্বর চোখ ফিরিয়ে নিলেন : কী হবে সে-সব কথা বলে। আমার শরীর ভালো নয়, যা বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলে চলে যাও।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি। এবারে সত্যিই অভিমানবিদ্ধ হয়ে জয়া উঠে দাঁড়াল, সে-দিনের সেই যৌবন-দর্পিতা চকিতের জন্যে মনের মধ্যে জেগে উঠল হয়তো : কিন্তু একটা কথা বলতে এসেছিলাম। একদিন তো ঢের অনুগ্রহ করেছিলে, আজ আমি না খেয়ে মরব নাকি ?

—না খেয়ে মরবে। কেন ?

জয়ার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল : আমার মাসোহারা তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। আজ আমার যৌবন নেই বলেই কি—

—মাসোহারা! বন্ধ হয়ে গেছে!—রত্নেশ্বর চমকে উঠলেন।—কেন, মণি টাকা দেয় না তোমাকে?

—নাঃ।—জয়া করুণভাবে হাসল: বাপের খেয়ালের খেসারত দেবার মতো দায় তার নেই। ও টাকা দিয়ে অনেক কাজ করবার আছে—এই কথাই আমাকে সে জানিয়েছে।

বাপের খেয়ালের খেসারত দেবার দায় আজ মণীন্দ্রের নেই! মর্‌ফিয়ার বিষাক্ত স্পর্শে সমস্ত রক্তটা বিষ জ্বালার মতো জ্বলে উঠল রত্নেশ্বরের। দেওয়ালের গায়ে রামেশ্বর রায়ের ছবিখানার ওপর গিয়ে পড়ল তাঁর চোখের দৃষ্টি। খড়-খড়ির ফাঁক দিয়ে খানিকটা রোদ এসে যেন রামেশ্বরের মুখখানাকে জীবন্ত করে তুলেছে একটা অশরীরী দীপ্তিতে। আর কোলাহল শোনা গেল মণীন্দ্রের ঘর থেকে। ইংরেজী-বাংলায় মেশানো তুমুল তর্ক ওখানে উতরোল হয়ে উঠেছে। গ্রামের যত বেকার আর আড্ডাবাজ ছোকরার ভিড়।

রত্নেশ্বর বিছানার ওপর হেলে পড়লেন।

—আচ্ছা যাও তুমি, আমি দেখছি।

জয়া চলে গেল। এতদিন পরে যেন অনুভব করলেন রত্নেশ্বর, কী অসহায় তিনি—কী পরিমাণে অক্ষম আর শক্তিহীন। লিভারের বেদনাটা বিদ্যুতের মতো সুতীক্ষ্ণ চমক দিয়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে। আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি চকিতের জন্যে শোনা গেল নিভৃত প্রাণকোষের ভেতর। কিন্তু না-না-না—নিজের মধ্যেই একটা অতি তীব্র আর্তনাদ করে রত্নেশ্বর উঠে বসলেন। তিনি মরবেন না, এখনো সময় হয় নি তাঁর। আজও তিনি ফুরিয়ে যান নি—জ্বলবার মতো ইন্ধন দেহমন থেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি এখনো। মণীন্দ্র কি মনে করে,

একেবারেই অসহায় তিনি—এখনো তাঁর পরিত্যক্ত রাজদণ্ড তিনি হাতে তুলে নিতে পারেন না ?

কিন্তু আজ আর রত্নেশ্বরের বিশ্রাম নেই। একজনের পর আর একজন।

এইবারে বুড়ো সদর নায়েব এসে দাঁড়াল।

—তুমি, ত্রিভুবন ? তোমার আবার কী চাই ?

সদর নায়েব, কিন্তু কোনো দীনতা বা বিনয়ের আভাস নেই ত্রিভুবনের ব্যবহারে। একসঙ্গে দু'জনে উন্মত্ত রাত কাটিয়েছেন বহু বার। বাইজীর স্খলিত বস্ত্র বিহ্বল নৃত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে যখন জড়িত কণ্ঠে বাহবা দিয়ে গেছেন তিনি, তখন দুহাতে পাগলের মতো তবলা ঠুকেছে ত্রিভুবন। নেশার প্রগাঢ় আচ্ছন্নতায় পরস্পরকে জড়িয়ে একই ফরাসের ওপর দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ত্রিভুবনও আজ বুড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু রত্নেশ্বরের মতো অথর্ব হয়ে পড়েনি অতটা। হয়তো তাঁর মতো রাজকুল-সম্ভূত নয় বলেই রাজ ব্যাধিটা অমন ভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি সে। স্থির অকম্পিত গলায় ত্রিভুবন বললে, এবার আমাকে বিদায় দিন বাবু।

—বিদায় ? তোমাকে ? কেন ?

—জমিদারীর যা-কিছু, প্রজার জন্যে বিলিয়ে দিলে আমার থাকা না-থাকা সমান কথা। এখন মানে মানে বিদায় নেওয়াই তো ভালো।

নির্বাক দীর্ঘায়ত চোখে রত্নেশ্বর তাকিয়ে রইলেন।

—মনিবের কাজ করেই মাইনে নিই আমরা।—পুরো পাঁচ হাত লম্বা ত্রিভুবন দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা কঠিন সরল রেখায়। তিনটে খুন, দু'টো আগুন দেওয়া আর পাঁচটা দাঙ্গার মামলায় যে আসামী হয়েছিল এ সেই লোক।—আজ যদি আমাদের কাজ ফুরিয়ে থাকে

তো বলুন আমরা চলে যাই। এখন কৃষক-সমিতির প্রজারা এসেই জমিদারী দেখা-শোনা করুক। মহালে মহালে কাছারী রেখেই বা কী লাভ? সেখানে এখন সব ইস্কুল বসিয়ে দিন, লাইব্রেরী করে দিন। লেখাপড়া শিখে দেশের লোক সব চতুর্ভুর্জ হয়ে উঠুক।—ত্রিভুবন যেন হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সত্যিই কি হাসল সে? খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন যেন বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

—যাও—যাও—যাও।—রত্নেশ্বর এবার চীৎকার করে উঠলেন। —আমি মরিনি, মরিনি এখনো। আমি মরব না। আমি বেঁচে উঠবই। তুমিও অপেক্ষা করো ত্রিভুবন, ধৈর্য হারিয়ো না।

—বেশ, ভালো কথা।—কুটিল আর অবিশ্বাসের দৃষ্টি রত্নেশ্বরের মুখের ওপর ফেলে বেরিয়ে গেল ত্রিভুবন। আর নীচের তলায় মণীন্দ্রের ঘর থেকে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবল তরঙ্গ কাঁপিয়ে দিলে সমস্ত বাড়িটা। রামেশ্বর রায়ের ছবির ওপর থেকে রোদের দীপ্তিটা কখন সরে গিয়েছে, ভেনাসের নগ্ন বুকের ওপর হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বসে আছে একটা হলদে রঙের কুৎসিত মাকড়সা—জরা-মৃত্যুর নিঃসংশয় সংকেত যেন।

রত্নেশ্বর আবার উঠে এলেন টিপয়টার দিকে, নীল রঙের শিশিটা থেকে সিরিঞ্জে পুরে নিলেন মরফিয়া। আবার তার তীক্ষ্ণাগ্রটা বিদ্ধ হল ত্বকের মধ্যে, ছড়ালো মৃত্যুরূপী জীবন বিদ্যুৎ। কিন্তু আশ্চর্য, রত্নেশ্বর রায় এবার বেদনা বোধ করলেন, যেন অতি তীব্র একটা বেদনা। রত্নেশ্বর কি ভেঙে পড়েছেন, তাঁর মনের মধ্যেও কি শিকড় মেলেছে নিভৃত দুর্বলতার বীজ?

অনেক রাত্রে ঘরে ফিরল মণীন্দ্র। গ্রামে গ্রামে সভা—দিকে

দিকে একতার সুনিশ্চিত সোনার সম্ভাবনা। যে নতুন ফসল এত দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে, তাকে ঘরে তুলবার আশায় শান পড়েছে কাস্তের ফলাতে। মহামানবের মহানগরী গড়ে উঠবে লোহায় লক্কড়ে, কারখানার আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্যে। নেহাইয়ের ওপর ঝন্ ঝন্ করে ঘা দিচ্ছে কামারশালার কঠিন হাতুড়ি—আর ভেতর দিয়ে শোনা যাচ্ছে অদূরাগত কালের সুনিশ্চিত প্রতিধ্বনি :

আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে মন। নতুন পৃথিবী। শঙ্কামুক্ত—সংশয়মুক্ত। রণক্ষেত্রে মৃত্যু ঈগলের মতো করাল পাখা মেলে উড়ে আসে না বোমারু। সিগফ্রিড্ আর ম্যাজিনোর ব্যবধান পরস্পরের দিকে বিদ্বেষ-বিষাক্ত দৃষ্টিতে মারণাস্ত্র উদ্যত করে প্রতীক্ষা করে না—বিস্তীর্ণ দিক-প্রান্তরে ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর ফসল, রাশি রাশি ফসল। সমৃদ্ধি আর কল্যাণ।

'কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান'—গুনগুন করে গাইতে গাইতে টেবিলে এসে বসল মণীন্দ্র, জ্বালালো ল্যাম্পটা। সমস্ত ঘরটা অসম্ভব অগোছালো হয়ে আছে, বই খাতা কাগজপত্র এলোমেলোভাবে চারদিকে ছড়ানো। তার এই ঘরটাই আজকাল পার্টি-অফিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলমে কালি ভরে নিয়ে লিখতে বসল মণীন্দ্র। অনেক রাত হয়ে গেছে—এতবড় বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে অদৃশ্য নিদালীর স্পর্শে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা, দেউড়িতে একটা নেড়ী কুকুর চীৎকার করছে নিতান্ত অকারণে—হয়তো বাদুড়ের ছায়া দেখেছে। মণীন্দ্রের আত্মমুখী মনটা নিজের মধ্যেই কখন তলিয়ে গেল সেটা টেরও পেল না সে। কলমের মুখে আশা আর আনন্দের অক্ষর মূর্তি নিয়ে লেখা ফুটতে লাগল :

"যাহারা বাধা দিতেছিল, তাহারা আজ একে একে জনতার দাবী মানিয়া লইতেছে। তাহারা একথা নিঃসংশয় ভাবে বুঝিতে পারিতেছে যে যতদিন তাহারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে, ততদিনই—"

—মণি।

মণীন্দ্র ভয়ানকভাবে চমকে উঠল, হাত থেকে কলমটা খসে পড়ল মেজের ওপর। রাত্রির এই নিঃশব্দ প্রহরে জীবনের পরপার থেকে একটা অপদেবতার আবির্ভাবের মতো তার দরজার গোড়াতে এসে দাঁড়িয়েছেন রত্নেশ্বর রায়। জীবন নয়—জীবনাতীত যেন অশরীরী সত্তা।

—বাবা?—মণীন্দ্র বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল। আজ পাঁচ বছর ধরে সে সম্ভাষণ করেনি রত্নেশ্বরকে, চোখ তুলে তাকায়নি তাঁর দিকে। এই মুহূর্তে সে যেন তাঁকে নতুন করে দেখল, দেখল অভিশাপের মতো একটা অশুভ আবির্ভাবকে। মণীন্দ্রের ভয় করতে লাগল। মরফিয়ার প্রভাবে রত্নেশ্বরের চোখ দুটো জ্বলছে—আরো বেশী করে জ্বলছে অন্তর্নিহিত কী একটা প্রেরণায়। যাদুকরের দৃষ্টিতে মানুষ যেমন সম্মোহিত হয়ে থাকে, তেমনি করেই মণীন্দ্র তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

—তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

অস্পষ্ট অস্ফুট গলায় মণীন্দ্র বললে, বলুন।

—এখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।

রত্নেশ্বরের সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন রহস্যের কালো রন্ধ্রহীন আবরণ। সেই আবরণের ভেতর দিয়ে বস্তুবাদী মণীন্দ্রের চোখ কোনো কিছুকে দেখতে পাচ্ছে না—কোনো কিছুর অর্থবোধ করতে পারছে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মমির সঙ্কেতে উঠে দাঁড়াল মণীন্দ্র।

—চলুন।

বিস্তীর্ণ উঠোনটা ঘন অন্ধকারে মূর্ছিত। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা হেঁটে চলল। মণীন্দ্র কিছু দেখতে পাচ্ছে না, অথচ প্রায়-অন্ধ রত্নেশ্বর রায় তার ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছেন কী করে! তাঁর হাতের লাঠিটা বাজছে খট খট করে। আর সেই শব্দতরঙ্গটা নিস্তব্ধ বাতাসের বুকে অনুরণন জাগিয়ে তুলছে। মণীন্দ্রের ক্রমাগত মনে হতে লাগল এই রাত্রে—এই অন্ধকারে অসংখ্য ছায়ামূর্তি নেমে এসেছে এই অভিশপ্ত বাড়িটার ওপরে। রামেশ্বর রায়, যদুনন্দন রায় —কুখ্যাতকীর্তি তার প্রাক্-পুরুষের দল। বিস্মৃতনামা আরো কত কে।

দুজনে হেঁটে চলল। রত্নেশ্বরের মহলে নয়—মহল ছাড়িয়ে দূরে, অনেকটা দূরে। মণীন্দ্রের যেন চেতনা নেই, যেন তার সমস্ত শক্তিকে হরণ করে নিয়েছেন রত্নেশ্বর। শুধু রত্নেশ্বর একাই নন, তাঁর সঙ্গে আরো অনেকে, আরো কতজন।

মণীন্দ্রের যখন চমক ভাঙল তখন দেখা গেল ওদের সামনে কুলদেবতার মন্দির। কালী। মন্দিরের দরজা খোলা—একটা ছোট্ট প্রদীপ জলছে মিট মিট করে আর তার আলোতে দেখা যাচ্ছে নৃমুণ্ড আর খড়্গ-কৃপাণ-ধারিণী বিভীষণা মূর্তি। তাঁর রক্তাক্ত জিভ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত—তাজা রক্ত যেন গড়িয়ে পড়ছে। কুলদেবতা। —রত্নেশ্বরের পূর্বপুরুষেরা কার্তিকী অমাবস্যায় এখানে নরবলি দিতেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

পেছন ফিরে অকস্মাৎ যেন বজ্র কঠিন মুষ্টিতে রত্নেশ্বর মণীন্দ্রের একখানা হাত চেপে ধরলেন—তাঁর অবশিষ্ট অন্তিম শক্তিতে। চোখ দুটোতে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রদীপের আলো। মণির চোখ। জীবন নয়—শুধু আগুন।

—তুমি রায়বংশের ছেলে। প্রতিজ্ঞা করো, এই বংশের মর্যাদা তুমি রাখবে। তোমার পূর্বপুরুষেরা যে-পথে চলেছেন, সে-পথ ছাড়া আর কোনো পথ তোমার নেই। প্রতিজ্ঞা করো, প্রতিজ্ঞা করো এই কুলদেবতার সামনে!

নিজের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম চলেছে। মণীন্দ্র জেগে ওঠবার চেষ্টা করছে—প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে বলতে চাচ্ছে: না, না, এমন প্রতিজ্ঞা সে কখনো করতে পারবে না। তার পথ আলাদা, তার জীবনের গতি স্বতন্ত্র। সত্যকে সে চিনেছে, উপলব্ধি করেছে তাকে। —না—না—না।

কিন্তু কোনো কথা সে বলতে পারল না। রত্নেশ্বর রায়ের ব্যক্তিত্ব, শুধু ব্যক্তিত্ব নয়—জীবনাতীত শক্তি তাকে অভিভূত করে ফেলছে। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম চলে, কিন্তু যেখানে জীবন নেই, সেখানে? সেখানে কী করবে, কী করতে পারে সে?

—প্রতিজ্ঞা করো।

হয়তো প্রতিজ্ঞাই করে বসত, কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বলে নিজেকে সংযত করলে মণীন্দ্র। কালীর হাতে খড়্গ কৃপাণ ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে—লক্ লক্ করছে লালায়িত জিহ্বা। মণীন্দ্র এ সব কিছু মানে না, কিছু বিশ্বাস করে না, মানুষের কোন্ অন্ধতাকে আশ্রয় করে দেবতা জন্ম নিয়েছে—এ তথ্যও সে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তটা অদ্ভুত—এই মুহূর্তটা সমস্ত যুক্তি আর জ্ঞান বিজ্ঞানের বাইরে। অভিভূতের মতো মণীন্দ্র ভয়ার্ত চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল, তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর করে।

—করবে না, করবে না প্রতিজ্ঞা? তুমি রায় বংশের ছেলে, রায় বংশের নাম ডোবাবে?—অকস্মাৎ, অত্যন্ত অকস্মাৎ হু হু করে

কেঁদে ফেললেন রত্নেশ্বর। মমির আগ্নেয় চোখ নিবিয়ে দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে শুরু করল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে গেল মণীন্দ্র। বেঁচে উঠল তার সমস্ত মৃত্যু-মগ্ন জীবনী-শক্তি, তার কর্মী মন, জেগে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখ। রত্নেশ্বর রায় মমি নন, তিনি অস্বাভাবিক আসাধারণ কিছু একটা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নন, তিনি মানুষ। এ জল মানুষের চোখের, মানুষের দুর্বলতার, মানুষের অসহায়তার।

সর্বাঙ্গে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মণীন্দ্র দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। কালীর খড়্গটা টিনের তৈরী, প্রসারিত জিভটায় গাঢ় লাল রঙের প্রলেপ, সেখানে রক্তের আভাস খুঁজতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কী হতে পারে।

মণীন্দ্র সহজ সুস্থ গলায় বললে, এই রাত্রে কী ছেলেমানুষি করছেন বাবা। ঘরে চলুন। আমি রায়বংশের ছেলে তা আমি জানি, তার চাইতে বড় পরিচয় যে আমার আছে, সে-ও আমি জানি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না—চলুন।

রত্নেশ্বর মণীন্দ্রের কথা শুনতে পেলেন কি-না কে জানে। তিনি তখন নিতান্ত অসহায়ের মতো মন্দিরের রকের ওপর বসে পড়েছেন —মরফিয়ার অবসন্ন প্রতিক্রিয়া। প্রায়-অন্ধ চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে বুকের ওপর।

ধরা গলায় রত্নেশ্বর বললেন, কোথায় যাবো? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—সমস্ত অন্ধকার।

বলিষ্ঠ মুষ্টিতে রত্নেশ্বরের শিরাসর্বস্ব হাতখানা ধরলে মণীন্দ্র—এবার তার পালা। তারপর গভীর সহানুভূতির স্বরে বললে, কোনো ভয় নেই বাবা, আপনি আমার সঙ্গেই চলুন।



নদীর ওপারে বড় জংশনটার পাশে মিলিটারী কলোনী। আগে প্রায় ষাট-সত্তর বিঘে জুড়ে, ধু ধু করত অনাবাদী জমি—প্রকৃতির অভিশাপ লাগা মরা মাটি। ধান-পাট দূরে থাক, একমুঠো কলাই বুনেও ওখান থেকে কেউ ঘরে তুলতে পারত না। তবু পৃথিবীতে যাদের প্রাণশক্তি সব চাইতে বেশি, সেই ঘাসের বিবর্ণ আর কুশের আগার মত তীক্ষ্ণ অঙ্কুরগুলো ইতস্ততভাবে সমস্ত মাঠখানাকে আকীর্ণ করে রাখত। হাড় বের করা গোরুর পাল ক্ষিদের জ্বালায় ওখানে খাদ্যের সন্ধান করত; ধারালো ঘাসের আগায় মুখ কেটে গিয়ে টপ টপ করে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ত আর তৃষ্ণার্ত মাটি চোঁ চোঁ করে এক চুমুকে সেই রক্ত শুষে নিত।

সেই মাঠ। বিশ্বকর্মার হাতুড়ির ঘা পড়েছে। দেহাতী মানুষগুলো দূর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একপাল চখা-চখীর মতো সাদা সাদা তাঁবু আর খড়ের চালাগুলো যেন ঝাঁক বেঁধে আকাশ থেকে উড়ে পড়েছে ওখানে। রাত্রে বিদ্যুতের ঝলমলে আলো। মায়াপুরী।

ওদেরই দাবী। সামগ্রিক যুদ্ধের দাবী। রোজ পাঁচশো করে ডিম জোগাতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে এত ডিম? পেটের দায়ে লোক হাঁস-মুরগী বেচে খেয়েছে—তিনখানা গ্রাম ঘুরলে এক কুড়ি যোগাড় করা যায় না। মেজাজ যেদিন চড়ে যায় সেদিন

প্যারীলাল ভাবে, মানুষে কেন ডিম পাড়তে পারে না? আর ঘোড়া? তা হলে পাঁচশোর জায়গায় পঞ্চাশটা দিয়েই ওদের রাক্ষুসে পেটগুলো ভরানো চলে।

বড়দিন আসছে—হ্যাপি নিউ ইয়ার। ক্রিস্‌মাস কেক চাই, আর চাই নব বর্ষের প্রীতিভোজ। সুতরাং পাঁচ-শ ডিমের দাবী দাঁড়িয়েছে এক হাজারে। প্যারীলাল বিড় বিড় করে বকতে লাগল। ডিম যেন তার দিন রাত্রের দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, আকাশে তারা নেই—শুধু রাশি রাশি জ্যোতির্ময় ডিম ওখানে আলোক বিস্তার করছে। মাটি দিয়ে মানুষ চলছে না, শুধু হাত-পাওয়ালা একদল ডিম মিলিটারী ভঙ্গিতে মার্চ করে চলেছে: রাইট্, লেফট্, অ্যাবাউট টার্ণ—কুইক্ মার্চ।

ক্ষেপে গিয়ে প্যারীলাল হাত পা ছুঁড়তে লাগল। কী হয় একরাশ চিল-শকুনের ডিম সাপ্লাই দিলে? কামান আর বোমা যারা অক্লেশে হজম করতে পারে শকুনের ডিম তো তাদের কাছে নস্য বিশেষ। কিন্তু তাই বা পাওয়া যাবে কোথায়? রেল লাইনের ধারে বসে যে শকুন কাটা-পড়া সাপ আর কুকুরের মাংস নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করত, কিংবা টেলিগ্রাফের তারে যে-সব চিল নীচের জলা থেকে মাছের আশায় ধ্যানস্থ থাকত, মিলিটারী টার্গেট প্র্যাক্‌টিশের চোটে তারা প্রায় নির্বংশ হয়েছে। এখন—এই দুর্দান্ত দুঃসময়ে মানুষে যদি কিছু কিছু ডিম পাড়তে পারত, তা হলে এই মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতো প্যারীলাল।

মেজর সাহেব পিঠ চাপড়ে দিয়ে প্যারীলালকে যেন জল করে দিলে।

—ট্রাই, ট্রাই গুড্‌বয়—ট্রাই এগেন।

সাহেবের সামনে নিতান্তই 'ক্রাই' করা যায় না, তা হলে কাপুরুষ বলে বাঙালী জাতীর দুর্নাম হবে। ডিমের সন্ধানেই যাত্রা করতে হল।

শীতের বিকেল। সমস্ত আকাশটা যেন মূর্ছিত হয়ে আছে মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে। টিপ টিপ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়বার চেষ্টা করছে—আবার কন্‌কনে হাওয়ায় জলের বিন্দুগুলো উড়ে যাচ্ছে দিগন্তে। পায়ের নীচে পালা-পড়া ঘাসে যেন তুলোর আঁশ জড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় অসহ্য ঠাণ্ডায় শরীরের হাড়-মাংসগুলো সব আলাদা হয়ে যাবে।

পায়ে দুটো মোটা মোটা মোজা পরলে প্যারীলাল। দুহাতে পুরু দস্তানা। মাফলারটাকে কানে আর গলায় শক্ত করে জড়িয়ে একটা গেরো বাঁধলে বুকের ওপর। তারপর গায়ে চড়ালো ফিকে নীল রঙের মোটা ওভারকোটটা। ব্যাস—শীতের সাধ্য কি এইবারে তার কাছ ঘেঁষতে পারে।

ওভারকোটের ওপর সস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে নিলে প্যারীলাল। সত্যিই খাসা জিনিস। কাশ্মীরী ফার, যেমন মোলায়েম, তেমনি গরম। একবার গায়ে ওঠাতে পারলে বাংলা দেশের শীত তো দূরের কথা, উত্তর মেরুতে গিয়ে অবধি নিশ্চিন্ত থাকা চলে। এই যুদ্ধের বাজারে দুশো টাকা ধরে দিলেও এখন এমন একটা কোট পাওয়া যাবে না। মিলিটারী মাল—একটু কাঁচা বা খেলো কারবার নেই কোনখানে।

কোটটা পরতে পরতে প্যারীলালের মন অকারণেই অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল। জীবনে কোন দুঃখই অবিমিশ্র নয়—সব কিছু বিড়ম্বনারই

সান্ত্বনা আছে একটা। মেজর সাহেবের বিশ্বগ্রাসী ডিমের ক্ষুধা তাকে বিব্রত করে তোলে বটে,* কিন্তু এ কথাটাও কোনো মতে ভুললে চলবে না যে, এই কোটটা তিনিই তাঁকে বকশিস করেছেন। তাঁর কাছে প্যারীলালের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু কোথায় ডিম? আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যটা যদি এখন তার সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলে একটি মাত্র প্রার্থনাই তার করবার আছে। ঐশ্বর্য নয়, ধন-সম্পত্তি নয়, চীন দেশের বোঁচা নাক রাজকন্যাও নয়। ডিম দাও প্রভু, ডিম দাও। জোগাড় করতে না পারো, পেড়ে দাও। একটা নয়, দুটো নয়, এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়িও নয়। হাজার, হাজার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ—এমন একটা ডিমের পাহাড় খাড়া করে দাও যে, তার চুড়োটা যেন মাউণ্ট এভারেষ্টের চুড়োকেও ছাড়িয়ে ওঠে। হায় আলাদীন! রক্ পাখীর ডানার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনগুলোও উড়ে গেছে চিরকালের মতো।

একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যারীলাল বেরিয়ে এল।

শীতার্ত অনুর্বর মাঠ। ঘাসের তীক্ষ্ণ মুখ ঠাণ্ডায় যেন ছুরির ফলার মত ধারালো হয়ে আছে। মানুষের খালি পা পড়লে কেটে ফেটে একরাশ হয়ে যাবে। তবু ওর ভেতর দিয়ে খালি পায়েই হেঁটে যায় মানুষ। তাদের পায়ের তলায় হুক-ওয়ার্মের ক্ষত চিহ্ন, চামড়ার রঙ পোড়া কাঠের মত কালো, নখগুলো যেন হাতুড়ি দিয়ে ছেঁচে দিয়েছে কেউ। এই মাঠের ভেতর দিয়ে তারা হেঁটে যায়, ধারালো ঘাসের আগায় কালো রক্ত শুকিয়ে থাকে।

প্যারীলাল ওরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। তার পায়ে দামী পেটেণ্ট লেদারের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত টানা পশমী মোজা। পুরু ওভার-

কোটটার গায়ে হিমের কণা জমছে। ওপরে মেঘলা আকাশটা থম থম করছে যেন ভেঙে পড়বার সূচনায়।

একফালি টানা পথ ধরে প্রায় মাইলটাক এগিয়ে এলে গ্রাম। অথবা আগে গ্রাম ছিল। মন্বন্তরের ঝাপটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। ধ্বসে-পড়া চালা, পোড়ো ভিটে। মরা মানুষের দীর্ঘশ্বাসেই যেন রাশি রাশি বাঁশের পাতা উড়ে পথটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

—রজনী, ও রজনী। আছো নাকি বাড়ীতে।

একটা ছোট চালার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে প্যারীলাল। মাটি দিয়ে মসৃণ করে লেপা পুরু দেওয়াল—তার ওপর গেরি মাটির রঙে আঁকা শঙ্খ, পদ্ম, লতা। একদিন সমৃদ্ধি যে ছিল সে কথাই ঘোষণা করছে প্রাণপণে। ওদিকে শন ঝরে যাওয়া চালের ওপর দিয়ে আকাশ উঁকি মারছে, আর সেই ফাঁকগুলোর ওপরে খানিকটা ধোঁয়া কিংবা কুয়াসা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। ঘরের ধোঁয়াটা বাইরের ভারী হিমার্ত বাতাস ঠেলে বেরুতে পারছে না অথবা বাইরের কুয়াসা সবগুলো একসঙ্গে ভেতরে ঢোকবার জন্যে ঠাসাঠাসি করছে।

—বলি, রজনী আছো নাকি?

—ঠিকাদার বাবু ডাকছেন।—ভেতর থেকে সারদার গলা।

—আছি বাবু, আছি।—সাড়া দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল বুড়ো রজনী। অনাহারশীর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। হলদে রঙের চোখ দুটো যেন ঘুরছে। থুতনীর নীচে খানিকটা বিশৃঙ্খল পাকা দাড়ি, সারা গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন খোকড়া জড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। শীতটা সত্যিই বড় বেশি পড়েছে এবার। বুড়োর হাতের আঙুলগুলো কী অস্বাভাবিক নীল।

—তারপরে, ভালো আছো তো? একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে

প্যারীলাল জিজ্ঞেস করল এটা ভদ্রতার ব্যাপার, আলাপের ভূমিকা।

—ভালো ?—রজনী হাসবার চেষ্টা করল : আমাদের আর ভালো। এখনো মরিনি—এইটুকুই যা ভালো বলতে হবে।

—ওসব কথা কেন ভাবছো !—একটা পা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে প্যারীলাল চুরুটের ধোঁয়া রিং করতে লাগল : যুদ্ধ থেমে যাবে, আবার ফসল উঠবে, সুখ শান্তিতে ভরে যাবে দেশ। প্যারীলালের কণ্ঠ যেন দেবদূতের মতো উদাত্ত : তখন আবার এই বাংলা হবে সোনার বাংলা। —কথাগুলো প্যারীলালের নিজের কানেই যেন ভালো লাগতে লাগল—বাস্তবিক মাঝে মাঝে সরস্বতী এসে যেন বাণী দেন তাঁর গলায়। একটা স্বর্গীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রজনীকে সে অভিভূত করে দেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু রজনী তবু হাসে। দাঁত-ঝরে-যাওয়া মাড়ির ভেতর দিয়ে খানিক কালো হাসি বেরিয়ে এল : সোনার বাংলা ? কবে ছিল ? বুকের রক্ত জল করে আর চোখের জল না ফেলে দুমুঠো ভাত কোনোদিন জোটেনি—দশ বছর আগেও নয়। বেগার ছিল, থানার দারোগা ছিল, উচ্ছেদের নোটিশ ছিল। বাড়তির মধ্যে এবার দুঃখের পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে দুমুঠো ভাতও অদৃশ্য হয়েছে। সেই লজ্জা আর অপমান মেশানো রাঙা বাগ্‌ড়া চালের ভাত আর লাফা শাকের তেতো চচ্চড়ি এই কি সোনার বাংলার রূপ ? হয়তো হবে।

কিন্তু ঠাণ্ডায় আর দাঁড়াতে পারছে না রজনী। মাঠের ওপার থেকে হাওয়া আসছে, হাড়ের ভেতর বাজছে ঝনঝনানি। গায়ের ধোকড়টাও যেন বরফে তৈরী। অথচ সামনে দাঁড়িয়ে প্যারীলাল বক্তৃতা দিচ্ছে সোনার বাংলার সোনালি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। চুরুটের

ধোঁয়া চাকার মতো গোল হয়ে তার মাথার চারদিকে যেন স্বর্গীয় দীপ্তিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, ফার কোটের রোঁয়ার ওপরে জমেছে হিমের কণা—চিক চিক করে জ্বলছে—যেন অশরীরী জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—তারপর, কিছু ডিমের জোগান দিতে হবে যে।

—ডিম! ডিম এখন পাওয়া বেজায় শক্ত বাবু।

—তা হলে তো চলবে না—স্বর্গদূত আবার একটা মহিমময় দৃষ্টি প্রক্ষেপ করে রজনীকে বশীভূত করবার চেষ্টা করলে: দামের জন্যে আটকে থাকবে না।

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?—দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে বাজিয়ে রজনী বললে: আর যে শীত। ঘর থেকে বেরুতে গেলে হাত পা যেন ফেটে যায়। বৃষ্টিও পড়ছে।

—ওই তো, ওই তো।—প্যারীলাল ভ্রূভঙ্গি করল: গায়ে অতবড় একটা চটের ধোকড়া, আবার শীত কিসের রে? ব্যাটারা বাবুয়ানি করেই গেলি। নে, আড়াই টাকা করে ডজন পাবি। কাল অন্তত তিন ডজন জোগাড় রাখবি—যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক।

কোটের জ্যোতির্ময় ধোঁয়াগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে যেন ধোঁকা লেগে যায় রজনীর। শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলো অসাড় হয়ে এসেছে, চোখের সামনে ঘুরছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

—চেষ্টা করব বাবু।

—চেষ্টা নয়, চাই-ই চাই। মনে থাকে যেন। ভারী জুতোর শব্দ করে প্যারীলাল চলে গেল।

ঘরের মধ্যে সারদা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিব্রত হয়ে আছে। বছর আটেক ছেলেটার বয়েস—ম্যালেরিয়ায় চুষে নিংড়ে খেয়েছে তাকে।

পেটের পিলেটা এমন ফুলেছে যে, আশংকা হয় একদিন ওটা তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ক্যাল্‌শিয়ামের অভাবে অপুষ্ট হাড়গুলো প্যাকাটির মতো শীর্ণ—হঠাৎ একটুখানি ঘা লাগলে যেন মট করে ভেঙে যেতে পারে। একটা ছেঁড়া চট জড়িয়ে সেও থর থর করে কাঁপছে—মাঝে মাঝে মাটির একটা মালসা থেকে খানিক শুকনো ভাত খাবায় খাবায় মুখে পুরছে। ম্যালেরিয়ার পথ্যই বটে।

কঙ্কালসার বুকের মধ্যে কাশছে মেয়েটা। মায়ের বুক শুকনো, চুষলে দুধ তো দূরে থাক এক বিন্দু রক্তও বেরিয়ে আসে না বোধ করি। ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে সারদার শীত কাটছে না—তবু গায়ের গরম দিয়ে সে কোনো মতে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। রজনীর পুত্রবধূ সারদা। ছেলে নিবারণ শহরে গেছে রিক্‌সা টানতে। আধিতে যা পেয়েছিল তাতে দু-দিনও পেট চলে না। তাই শহর তাকে টেনে নিয়ে গেছে আজ দু-মাস। এ পর্যন্ত কোনো খবর নেই।

ঘরে ঢুকে একটা বিড়ি ধরালো রজনী। ধোকড়ার নীচে পরলে ছেঁড়া জামাটা। তবু শীত কাটে না।

—এক মাল্‌সা আগুন করবি বউ? শীতে যে জমে গেলাম।

—আগুন? কী দিয়ে জ্বালব? সারদা ঝলসে উঠল।

—ওই তো খড়ি আছে, ঘুঁটে আছে—

—খড়ি আছে, ঘুঁটে আছে। সারদা ভেংচে উঠল—শ্বশুরের সম্মান রাখবার মতো গলার আওয়াজটা তার নয়: দিনে সব পুড়িয়ে শেষ করে দিলে রাত্তিরে কী হবে তখন। বাচ্চাকাচ্চাগুলো একটাও বাঁচবে না।

দুর্বল স্থবির দেহে যতটা সম্ভব শিখায়িত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে রজনী:

—কেন, বসে বসে নবাবী না করলে চলে না? দুটো খড়ি কুড়িয়ে রাখতে পারিসনে হারামজাদী!

ভাঙা কাঁসরের মতো গলায় অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সারদা, যেন প্রেতিনীর আর্তনাদঃ খড়ি! খড়ি আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়, তাই না! তুমি মরলে চিতেয় দেবার জন্যে খড়ি কুড়িয়ে রাখব।

—বটে, বটে!

অসহ্য ক্রোধে রজনী কাঁপতে লাগল, একটা কিছু করে ফেলবে—একটা কোনো ভয়ানক কাণ্ড। কিন্তু কিছুই করলে না, শুধু ধোকড়াটা গায়ে জড়িয়ে শিথিল গতিতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

—এখন কোথায় চললে আবার?

—মরতে!—রজনী চলে গেল। দরজার ওপার থেকে বললে, চিতার কাঠ জোগাড় রাখিস।

বাইরে শীত পাথরের মতো পৃথিবীর বুকে চেপে বসেছে। মেঘলা আকাশে ধোঁয়ার মতো আরো মেঘ জমে উঠছে—পাণ্ডুর অন্ধকার যেন ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে। আড়ষ্ট পায়ে রজনী এগিয়ে চলল, ফাটা পা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল ক্ষুধার্ত বন্ধ্যা মাটিতে।

রজনী ফিরল যখন, তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়েছে। সন্ধান বৃথা হয়নি। তিনখানা গ্রাম ঘুরে দু-কুড়ি ডিম যোগাড় হয়েছে। ঠিকাদার বাবুর নামের মহিমা আছে। হাঁস-মুরগীগুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ডিম পাড়তে লেগে যায় যেন। ডজন প্রতি তিন গণ্ডা পয়সাও যদি প্যারী-লাল তাকে কমিশন দেয় তা হলে কম্‌সে কম অন্তত দশ আনাতে এসে দাঁড়ালো।

দশ আনা পয়সা। তিন চারটি প্রাণীর একবেলার খোরাক।

প্যারীলালের অনুগ্রহ আছে তার ওপরে, অস্বীকার করলে অধর্ম হবে। মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে সারদার দিকে তাকায়, তা নইলে আপত্তি করবার বিশেষ কিছুই ছিল না।

কিন্তু দশ আনা পয়সা। তার জন্যে অনেকখানি খেসারত দিতে হয়েছে। পা দুটো জমে অসাড় হয়ে আছে—শুধু ফাটা জায়গাগুলো থেকে এক একটা তীব্র জ্বালা বিদ্যুৎ-চমকের মতো শিউরে দিচ্ছে সমস্ত শরীরকে। ঠাণ্ডায় নাক দিয়ে জল পড়ে মুখটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে চোখের জলও হয়তো মিশে রয়েছে খানিকটা।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু মনটা খুশি হয়ে উঠলো।

গন্‌গনে আগুন জ্বালিয়েছে সারদা। বাইরের জগতের শীত-জর্জর নিষ্ঠুরতার হাত থেকে যেন স্বর্গলোকে প্রবেশ। একটু আগেকার কুশ্রী কলহের কথা মনেও রইল না। লোভীর মতো আগুনের পাশে বসে পা দুটোকে মেলে দিলে রক্তিম শিখাগুলোর ওপরে।

টকটকে লাল আগুন। রক্তের মতো রঙ। মানুষের বুক থেকে যে রক্ত শুকিয়ে গেছে তা রূপায়িত হয়েছে আগুনে। সমস্ত ঘরটা লাল ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—সারদার মুখটাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত আর অপরিচিত। পা দুটোকে আগুনের ওপর ধরে দিয়ে চুপ করে বসে রইল রজনী। অন্য সময় হলে পুড়ে ফোসকা পড়ে যেত, কিন্তু এখন এতবড় আগুনটাকেও যেন মনে হচ্ছে যথেষ্ট গরম নয়।

সারদা জিজ্ঞেস করল আস্তে আস্তে: পেলে ডিম?

—হ্যাঁ, দু-কুড়ি। ভালো করে রেখে দে—সকালে ঠিকাদারকে দিতে হবে। দশ আনা পয়সা মিলবে।

ম্যালেরিয়াজীর্ণ ছেলেটা এক কোণ থেকে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে উঠল।

—মা, আমি ডিম খাবো।

—খবর্দার, খবর্দার !—রজনী হঠাৎ বাঘের মতো গর্জে উঠেছে : ডিম খাবে ! একটা ডিম ছুঁয়েছিস কি মাথা ভেঙে দু-খানা করে দেব।

ছেলেটার ঘ্যানঘ্যানানি তবু থামে না। অসুখে ভুগে ভুগে অসম্ভব লোভ বেড়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে ক্ষুধার্ত শেয়ালের মতো।

—মা, আঁমি ডিঁম খাঁ—বো—

সারদা ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে এলো সস্নেহে : না বাবা, ডিম খায় না। গরীবের ডিম খেতে নেই। রজনী চুপ ক'রে রইল। মনটা ভারী হয়ে গেছে। গরীবের ডিম খেতে নেই। শুধু ডিম ? কিছুই খেতে নেই। গরীব যদি খেতে পায় তা হ'লে পৃথিবী চলবে কেমন করে ? সব ওলট পালট আর বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে যে।

ছেলেটা তবু কাঁদছে। রজনীর হাত নিস-পিস করে। একটা কিছু করতে চায়। ইচ্ছে গলা টিপে ওটাকে থামিয়ে দেয় একেবারে। খেতে চায়, কেন খেতে চায় ? কার কাছে খেতে চায় ? শুকিয়ে মরে যেতে পারে না নিঃশব্দে ? নিজেও বাঁচে, পৃথিবীরও হাড় জুড়িয়ে যায়।

একটা মালসায় করে খানিকটা কড়কড়ে ভাত আর শাক চচ্চড়ি নিয়ে এল সারদা : খেয়ে নাও।

ঠাণ্ডা আধপচা ভাত—তেতো শাকের ঘণ্ট। গলা দিয়ে একগ্রাস নামে তো পেটের ভেতর থেকে শীতের প্রচণ্ড শিহরণ উঠে মাথা পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে দেয়—দাঁতে দাঁতে খট খট করে বাজতে থাকে। কেন কে জানে, ডিমগুলোর ওপরে দুর্দান্ত একটা লোভ এসে রজনীর মনকেও আচ্ছন্ন করে দিলে। কতদিন সে ডিম খায় নি।

কিন্তু—না। ঠিকাদার বাবুর জোগান। সাহেবদের নতুন বছর

আসছে, তাদের উৎসব হবে, খানাপিনা হবে। ওদিকে দৃষ্টি দিলেও মহাপাতক। থাবায় থাবায় অখাদ্য ভাতগুলো গলার মধ্যে ঠেলে দিতে লাগল রজনী। অসহ্য শীতে পেটটা মোচড় দিচ্ছে, ঠেলে বমি উঠে আসছে যেন।

ছেলেটি আবার প্যানপ্যান করে উঠল : ডিম—

কোথা থেকে কী হয়—রজনীর মাথার মধ্যে রক্ত চড়ে গেল। ভাতের মাল্‌সাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে, তারপর বিদ্যুতের মতো দাঁড়িয়ে উঠল। নিজের অতৃপ্ত লোভের জালাটা বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়েছে, একটা অবলম্বন পেয়েছে সে।

দাঁতে দাঁতে পিষে রজনী বললে, ফের ডিম! আজ তোকে খুন করে ফেলব।

মুহূর্তে একটা হ্যাঁচকা টানে রজনী ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে এল, তারপর নীল একটা হিমার্ত থাবা ছেলেটার গলায় বসিয়ে দিলে নির্মম ভাবে। মেরে ফেলবে।

আর্তকণ্ঠে সারদা চীৎকার করে উঠল : কী করছ?

লাল আগুনে রজনীর চোখ ভয়ংকর দেখাচ্ছে। আগুনের চাইতেও বেশি করে জ্বলছে সেটা : শেষ করে দেব।

—ছাড়ো, ছাড়ো, মরে যাবে যে।

—মরুক।

কঠিন হাতের চাপে ছেলেটার চোখ বেরিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো ছুটে এল সারদা, ঘরের কোণ থেকে লোহার শাবলটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ঘা বসালো রজনীর মাথায়। অস্ফুট একটা কাতর আর্তনাদ। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে রজনী তিনহাত দূরে ছিটকে

পড়ল—ছিটকে পড়ল আগুনের ওপর। সমস্ত ঘরময় আগুন ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে গেল।

সারদা দাঁড়িয়ে রইল বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। ছেলেটা নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, আর আগুনের শয্যায় মাথা রেখে তেমনি নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে রজনী। গায়ের ধোকড়াটা জ্বলে উঠেছে—মরা সাপ পুড়বার সময় যেমন অন্তিম আক্ষেপে মোচড় দেয় শরীরটাকে, তেমনি ভাবে একটা অসহায় চেষ্টা করেই রজনী স্থির হয়ে গেল। সারদা হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, রজনীর দাড়িটা পুড়ছে—ফটাস করে একটা শব্দ হয়ে খইয়ের মতো ফুটে উঠেই গলে গেল তার বিস্ফারিত ডান চোখটা। মানুষ পোড়া গন্ধ কী বিশ্রী।

মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্যারীলাল দেখতে লাগল, সমস্ত গ্রামটা জ্বলছে, এই দারুণ শীতে আগুন পোয়াচ্ছে যেন। আর এতদূরে দাঁড়িয়েও হঠাৎ তার অত্যন্ত গরম লাগতে লাগল—কাশ্মীরী ফারের কোটটা বড় বেশি গরম।



আপনারা পড়েছেন কিনা জানিনা, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে এক টুকরো সংবাদ বেরিয়েছিল। পদার্থ বিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পি, কে চৌধুরী একটা অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন। রাতে ঘুমোবার অ গে বিছানায় শুয়ে তিনি পাইপ খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই পাইপের আগুন ছিটকে পড়ে মশারির গায়ে. তারপর—

সংক্ষিপ্ত খবর। যুদ্ধের নানা রণাঙ্গন, নানা রাষ্ট্রিক বিতণ্ডার ভিড়ে ওর জন্যে বেশি স্থান দেওয়া হয়নি। তার দিন তিনেক পরে কাগজে দেখেছিলাম অধ্যাপক চৌধুরীর গুণমুগ্ধ ছাত্রদের উদ্যোগে দেরাদুনে একটা শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর গান্ধী জিন্না বৈঠক, পূর্ব প্রুসিয়ায় জার্মাণ ব্যূহ ভেদ, হল্যাণ্ডে কঠিন সংগ্রাম, মস্কোতে গুরুত্ব পূর্ণ সম্মেলন। রয়টারের মারফৎ বিশ্ব বার্তার ঝঞ্ঝাগর্জন অধ্যাপক চৌধুরীর মৃত্যুটাকে এক মুহূর্তে ঝরা পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি এত সহজে জিনিষটাকে ভুলতে পারছি না—

সুনন্দাদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পার্টি অফিসে।

কথা বলেন কম, মিষ্টি করে হাসেন বেশি। প্রথম প্রথম ভারী সংকোচ লাগত, একটু দূরত্ব রেখেই চলা ফেরা করতাম। তাঁর শ্যামবর্ণ দীর্ঘ চেহারাতে এমন একটা মনীষার দীপ্তি ছড়িয়ে ছিল যে, কিসের একটা সশ্রদ্ধ শঙ্কায় মনটা আপনা থেকেই পিছিয়ে আসত।

কিন্তু সংকোচ ভেঙে দিলেন সুনন্দাদি নিজেই।

শীতের রাত, প্রায় নটা বাজে। তিন চারজনে মিলে পার্টি অফিসে নিদারুণ তর্ক জমিয়ে তুলেছি। পেছন থেকে সুনন্দাদি এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

চমকে গেলাম।

সুনন্দাদি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, থাক ভাই আর তর্ক করতে হবে না! তোমার পরীক্ষা আসছে, লক্ষ্মী ছেলেটির মতো এখন বাসায় ফিরে চলো।

সসংকোচে বললাম, এই যাচ্ছি।

সুনন্দাদি বললেন. যাচ্ছি বললে তো হবে না, এখুনি যেতে হবে। মানে আমাকে একটু এগিয়ে দিতে হবে। তুমি তো আমাদের পাড়াতেই থাকো।

তর্কটা অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়তে হল। বললাম চলুন।

তুজনে ট্রাম থেকে নামলাম সাদার্ণ এ্যাভিনিউয়ের মোড়ে। শীতের আকাশ থেকে বরফের কুঁচির মতো হিমের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে, তু'পাশের বাড়িগুলো এর মধ্যেই যেন মাথা গুঁজে ডুব দিয়েছে কালো ঘুমের স্তব্ধতার মধ্যে। সাদার্ণ এ্যাভিনিউয়ের যে আলোগুলো এককালে কৃত্রিম জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করে বাসন্তী পূর্ণিমার আমেজ দিত, কালো রঙের গাঢ় প্রলেপের ফাঁকে তাদের দেখা যাচ্ছে মড়ার চোখের মতো। মধুচ্ছন্দা টু সীটারকে নির্বাসিত করে রাক্ষসের মতো ছুটছে ঝাক্সা ট্রাক—হেড লাইটের তীব্র আলোয় জ্বলছে শিশির ভেজা কালো পীচের পথ।

আমি ডান দিকে যাব, সুনন্দাদি বাঁয়ে। দেখি তিনি ট্রাম ষ্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন। বললেন, আর তু'পা এগিয়ে

দিতে তোমার কি অসুবিধা হবে রঞ্জন? সোলজারগুলো এ সময়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় ঘোরে—

বললাম চলুন চলুন, বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দিই আপনাকে।

—আবার কষ্ট করবে। তবে বেশিদূর যেতে হবে না, একটু এগোলেই আমাদের বাড়ি।

সত্যিই বেশি দূর নয়। সামান্য এগিয়ে ছোট একটা বাঁক, প্রায় তার মুখেই নতুন একখানা একতলা বাড়ি। বললাম সুনন্দাদি, তা হলে আমি যাই।

সুনন্দাদি বললেন এলে যখন, বোসোনা, একটু চা খেয়ে যাও।

বললাম, না না, এত রাতে আর—

—রাত কোথায়, এই তো সাড়ে ন'টা। ভয় নেই, দশ মিনিটের বেশি তোমায় আটকে রাখব না।

দরজাটা ভেজানো ছিল। আলগোছে ধাক্কা দিয়ে আলোকিত ড্রয়িংরুমের মধ্যে চলে এলাম আমরা। সুন্দর করে সাজানো ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি বই ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ছোট টেবিলে কতগুলো বিজ্ঞান সম্পর্কিত মাসিকপত্র। হাতীর দাঁতের কতগুলো খেলনা যেখানে সেখানে সাজানো রয়েছে। একধারে একটা মোটা ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে এক ভদ্রলোক ধ্যানস্থ হয়ে আছেন ডেক চেয়ারে। প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি—মাথার পাকা চুলে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

সুনন্দাদি চাপা গলায় বললেন, ইনি আমার বাবা। দেরাদুনে প্রফেসারী করতেন, এখন প্যারালাইজ্‌ড।

আমাদের পায়ের শব্দে ভদ্রলোক চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে চমকে গেলাম আমি। কী

অদ্ভুত চোখ। বন্য জন্তুর দৃষ্টির মতো একটা তীব্র আলোয় জ্বলজ্বল করছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরের সমস্ত শক্তি যেন এসে সংহত হয়েছে তাঁর চোখে। অমন তীক্ষ্ণ আর জ্বলন্ত দৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। অধ্যাপক পি, কে চৌধুরী।

সুনন্দাদি বললেন, বোসো ভাই রঞ্জন, বাবার সঙ্গে একটু গল্প করো। আমি ততক্ষণ চা নিয়ে আসি।

বললাম উনি অসুস্থ—ওঁকে বিরক্ত করা—

—না না, তাতে কী। বাবা গল্প করতে ভয়ানক ভালোবাসেন। তুমি বোসো, সংকোচ কোরোনা—হাল্কা চটির শব্দ করে সুনন্দাদি ভেতরে চলে গেলেন।

অধ্যাপক চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষ প্রখর দৃষ্টিতে। কেমন ভয় করছিল, কেমন একটা অস্বস্তির অনুভূতিতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল আমার। চৌধুরী অত্যন্ত শান্ত—প্রায় নিঃশব্দ গলাতে আমাকে বললেন, বোসো।

চোখের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কোনো সাদৃশ্য নেই। স্নেহ আর প্রশান্তি যেন উপচে পড়ছে। বললেন,—কী করো?

—এম এ পড়ছি। পরীক্ষা দেব এবারে।

—আর কী করো? পার্টি ওয়ার্ক?

মৃদু হেসে মাথা নীচু করে রইলাম।

—না, না, ডিসকারেজ করছি না আমি। জীবনে একটা ডেফিনিট লাইন বেছে নেওয়াই উচিত। ভালো হোক, মন্দ হোক, অন্তত পথ চলবার শক্তি আসে। ওই জন্যেই নন্দাকে আমি বাধা দিইনি।

কী আর বলব। শুধু বললাম, তা ঠিক।

চৌধুরী নড়েচড়ে বসবার চেষ্টা করলেন। দেখলাম, একটুখানি

নড়বার উপক্রম করতেই তাঁর শরীরে একটা অমানুষিক প্রয়াসের আভাস। মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ডান হাতের আঙুলগুলো করুণ-ভাবে কাঁপছে থর থর করে। পক্ষাঘাত। নিজের দেহের ওপর এতটুকু কর্তৃত্ব নেই। ভারী বেদনা বোধ হল।

কয়েকটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে চৌধুরী মাথার ওপরে আলোটার দিকে তাকালেন। ঝকঝক করে উঠল অত্যন্ত উজ্জ্বল আর দীপ্তি-মণ্ডিত চোখ দুটো। তারপর তেমনি নিঃশব্দ, প্রায় চাপা গলাতেই বললেন, মনে করো, ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। তারপরে কী হবে।

তারপরে কী হবে। প্রশ্নটা জটিল। ঠিক কেমন উত্তর দিলে চৌধুরী খুশি হবেন আমি বুঝতে পারলামনা। বললাম, সব রকম উন্নতির চেষ্টা—

—কী রকম উন্নতি ?

আবার বিপদে পড়ে গেলাম। বললাম, এই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, এগ্রিকালচারাল —

—ব্যাস থামো থামো।—শোনা যায়না এমনি নিঃশব্দ গলাতে উত্তেজনার স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল : হাঁ ইণ্ডাষ্ট্রী, ইণ্ডাষ্ট্রী চাই। কল-কারখানা ফ্যাক্টরী। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচতে হয় তা হলে কল কারখানা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

বললাম—সে কথা ঠিক।

—প্রমিথিয়ুস কে জানো ?

—জানি। প্রথম বিদ্রোহী মানুষ, যে পৃথিবীতে আগুন নিয়ে এসেছিল।

—ঠিক বলেছ, প্রথম বিদ্রোহী।—অধ্যাপক চৌধুরী আবার নড়ে-চড়ে বসবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করলেন। এত নিঃশব্দ গলায়

এমন তীব্রতা সঞ্চারিত হয়ে গেল যা আমি কল্পনাই করতে পারি না। আর সেই চোখ। প্রমিথিয়ুসের আগুন যেন সেই চোখে।

—আমরা তারই বংশধর। এই আগুন নিয়ে এসেছে আশীর্বাদ আর অভিশাপ। এই আগুনে আমরা প্রথমে কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খেয়েছি; যজ্ঞের আহুতি দিয়েছি, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পুড়িয়েছি। বার্ণারে আর ফার্ণেসে এই আগুনে হবি দিয়েছি বিজ্ঞানের দেবতাকে, আবার এই আগুন দিয়েই তৈরী করেছি ইন্‌সেন্‌ডিয়ারী বম্ব। বলো, সত্যি কিনা ?

অভিভূত হয়ে বললাম খুব সত্যি।

চৌধুরী বললেন পঁচিশ বছর অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের চর্চা করেছি আমি। পজিট্রন, নিউট্রন কিংবা মিসিট্রনের তত্ত্ব আমার ভালো লাগে না। থিয়োরীর দাম নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমি বুঝি বাস্তবকে, অতি বাস্তব এই পৃথিবীকে ? আর পৃথিবীর সব চাইতে বড় সত্য আমি কী জেনেছি জানো ? সে হচ্ছে আগুন।

—আগুন ?

—হাঁ, আগুন। আগুন ছাড়া আর কী আছে ? ল্যাবোরেটরীতে যাও, আগুন জ্বলছে; এঞ্জিন ছুটছে আগুনে; ডাইনমোতে আগুন; বিদ্যুতের আগুন ধরা পড়েছে মানুষের হাতে। লোহা লক্কড় সব আগুনে গলে গিয়ে রূপ নিচ্ছে তার প্রয়োজনের। মানুষের জীবনে যা কিছু গতি আর প্রগতি সব আগুন দিয়ে। ধ্বংস করছে আর গড়ে তুলছে। একাধারে রুদ্র আর শিব।

আমি চুপ করে রইলাম। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য আদৌ আছে কিনা অথবা কী পরিমাণে আছে জানিনা। কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরীর সেই চোখ আর কণ্ঠস্বর। বাইরে শীতের কালো রাত্রি—

টপটপ করে শিশির পড়বার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হিমেল হাওয়া কাঁচের জানালায় করাঘাত করে যাচ্ছে। লেকের পথে ঝান্সী ট্রাকের উদ্দাম গতিছন্দ। আর ঘরের মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৈজ্ঞানিক —তাঁর জলন্ত আগ্নেয়দৃষ্টি। আমি মূঢ়ের মতো তাঁর দিকে তেমনি ভাবেই তাকিয়ে রইলাম।

চৌধুরী বলতে লাগলেন : আদিম মানুষ আগুনকে পূজো করত। বৈদিক মানুষ আগুনকে বন্দনা করত সব দেবতার আগে—'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।' কথাটা আজও সত্য। অগ্নিই তো বিজ্ঞানের পুরোহিত, সেই তো 'হোতারং রত্নধাতমম্।' এক হিসাবে আমরা সকলেই অগ্নির উপাসক, সত্যি নাকি ?

চা নিয়ে সুনন্দাদি ঘরে ঢুকলেন। সহাস্যে বললেন, বাবা রঞ্জনকে সেই অগ্নিবন্দনা শোনাচ্ছেন বুঝি ?

চৌধুরীও হাসলেন। গলার স্বর আবার প্রশান্ত আর কোমল হয়ে এল। বললেন, হাঁ, সেই কথাই একেও বলছিলাম। কিন্তু তুই আমার পাইপটা ধরিয়ে দেতো মা। আগুন সর্বপাবন কিনা, তাঁকে নইলে আমার পাইপ অবধি অচল।

সুনন্দাদি পাইপ ধরিয়ে এনে দিলেন। বিশ মণ ভারী একটা পাথরকে যেমন করে টেনে তুলতে হয়, তেমনি একটা অমানুষিক প্রচেষ্টা করে ডান হাতটা ওপরে তুললেন চৌধুরী—মৃদুমন্দ টান দিলেন পাইপে। বললেন, স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে আন্দোলন করছ তোমরা। সে স্বাধীনতা কিসে আসবে ? শুধু রাজনীতির অধিকারেই নয়। আমার পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি সে স্বাধীনতা মানুষের যান্ত্রিকতায়, তার কল কারখানায়, তার ফ্যাক্টরীতে। দেশ জুড়ে আগুন জ্বালাতে হবে।

বার্ণারে, ফার্ণেসে, ডাইনামোতে। মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় তার যন্ত্রে, তার সার্থক জয় হবে যন্ত্রের যজ্ঞে। আর সেই যন্ত্রের দেবতা কে? আগুন। পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও—দেখবে তোমাদের যা কিছু সমস্যা সব সহজ হয়ে গেছে।

সুনন্দাদি বললেন, নাৎসী জার্মাণীর মতো?

—না, না, না।—চাপা গলায় যতটা সম্ভব চীৎকার করা যায় চৌধুরী তাই করে উঠলেন।—সে তো রুদ্র। তার প্রয়োজন নেই বলছি না, কিন্তু শিবকেও ভুলে যাচ্ছো কেন? সৃষ্টির ধর্মই তো তাই।

চৌধুরীর মুখের সামনে রহস্যের কুহেলি বিস্তার করে পাইপের ধোঁয়া খেলা করতে লাগল। অসাড় পঙ্গু শরীরের সমস্ত শক্তিকে ঘনীভূত করে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। অনাগত যুগের অগ্নিময় স্বপ্ন আমি তাঁর সর্বাঙ্গে রূপায়িত হতে দেখলাম। আশ্চর্য মানুষ। সংসারের পথে নিতান্ত অচল আর অপ্রয়োজন—অথচ কী বিরাট ভবিষ্যতের কল্পনায় আর কর্ম প্রেরণায় তাঁর সমগ্র চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

—আজ যদি আমার শক্তি থাকত—চৌধুরী বলে চললেন—আজ যদি শক্তি থাকত, তা হলে এই মন্ত্র আমি প্রচার করতাম। শুধু কথায় নয়, কাজেও। কী হবে ধান আর পাট ক্ষেত দিয়ে? কী হবে রুরাল আফলিফট্‌মেণ্টে? লোহা আর আগুন। প্রগতির এই একমাত্র পথ আর স্বাধীনতার এই একমাত্র লক্ষ্য।

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুনন্দাদি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। বুঝলাম, এইবারে উঠে পড়া উচিত।

সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলাম। অন্ধকার আর হিমাচ্ছন্ন সাদার্ণ এ্যাভিনিউ। চোখের পাতার ওপর হিমের কণা এসে জমছে—

লেকের দিক থেকে আসছে—ঠাণ্ডা বাতাস। শীতার্ত পা ফেলে চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম অধ্যাপক চৌধুরীর কথা। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং। পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও। আগুনের মধ্যেই মানুষের জয়, মানুষের মুক্তি।

তারপর প্রায় চার বছর পরে কাল সুনন্দাদির এক টুকরো চিঠি পেয়েছি।

'তখন আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না। বাবা বোধহয় ঝিমুতে ঝিমুতে পাইপ টানছিলেন। তারই খানিকটা আগুন কী করে ছড়িয়ে পড়ে মশারি ধরে যায়। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কী অসহায়-ভাবে বাবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সেই আগুন এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে—তাঁকে গ্রাস করতে চায়। চীৎকার করবার উপায় ছিলনা, সরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিলনা। সমস্ত জাগ্রত চেতনা নিয়ে—ভীতি-বিহ্বল চোখ মেলে তিনি বন্দী শিশুর মতো সেই আগুনের মুখে আত্মসমর্পণ করেছেন। আমার কী মনে হল জানো ভাই? সারা জীবন যিনি আগুনের উপাসনা করেছেন, আজ সেই উপাস্য দেবতার পায়ে নিজেকে বলি দিয়েই তিনি তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।'

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালাবার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন, একটা সামান্য পাইপের আগুন থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না কেন?